المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد

হৃদয় সম্প্রসারণ

('আলেমদের মতবিরোধ নিরসন)

ইমাম মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ-শাওকানী

شرح الصدور

(حل مشكلة الاختلاف بين العلماء)

للإمام العلامة

محمد بن علي الشوكاني

رحمه الله

হৃদয় সম্প্রসারণ

('আলেমদের মতবিরোধ নিরসন)

ইমাম মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ-শাওকানী

বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মা'সূমী
প্রধানঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ
আদ-দারুস সালাফীয়াঃ
মাক্কাঃ আল-মুকাররমাঃ

রিয়াসাতুল হারামাইন আশ-শারীফাইন
মাক্কাঃ আল-মুকাররমাঃ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা। অফুরন্ত আশীষ ও নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির ধারা বর্ষিত হোক সর্বশেষ রাসূল, আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মদের উপর তাঁর পরিজনের উপর তাঁর সাহাবীদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত সৎকর্মে তাদের অনুসারীদের উপর।

অতঃপর আল্লামাঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী আশ-শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ)'র লিখিত- এ মূল্যবান পুস্তিকাটি পাঠকের কাছে পেশ করতে পেরে মাসজিদুল হারামের নির্দেশনা বিভাগ আনন্দিত। এ বইয়ের মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ হলে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতে ফিরে যেতে হবে আর এ ফায়সালাই চূড়ান্ত। দীনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মাসয়ালার ব্যাপারেও একই নিয়ম। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতই হলো হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারী। 'আলেমগণ তাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনে, তাদের মর্যাদা ও অবদানের ক্ষেত্রে এবং 'ইলম ও ইমামতের ব্যাপারে পার্থক্য হলেও 'ইলমী মাসায়েলে কোন 'আলেমের কাওল/উক্তিকে অন্য 'আলেমের কাওলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না বরং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা 'আলেমদেরকেই সংশোধন করতে হবে। অস্পষ্ট বা দুর্জ্ঞেয় মাসয়ালাকে সঠিক দলীল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে সত্যের পথে পৌঁছে দিতে হবে।

ইমাম আশ-শাওকানী উদাহরণ পেশ করেছেন হারাম সংক্রান্ত মাসয়ালা যেমন- কবর উঁচু করা, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে দলীল পেশ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, এসব 'আমল হারাম। এ ছাড়া নাবী ও সৎ লোকদের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করার ব্যাপারেও তিনি কঠোরভাবে উম্মতকে হুশিয়ার করেছেন; কেননা এগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ 'আমল যা 'আকীদাকে দুষিত করে; 'আমলকে করে বিনষ্ট। এটা এক ধরনের ফিতনাঃ যা বিদ'য়াতের বুনিয়াদ এবং বড় শিরকের প্রথম স্তর। এ ধরনের ফিতনাঃ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

শায়খ আশ-শাওকানীর উপর আল্লাহ্ রহম করুন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন কেননা তিনি এসব প্রমাণ করেছেন, বয়ান করেছেন এবং নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহর কাছে আমরা দু'য়া করি যে, এ পুস্তিকাটি পাঠকের কাছে সহীহ্ 'আকীদার ব্যাপারে পথ-নির্দেশনামূলক হিসাবে গৃহীত হোক।

আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে কোন 'ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা শিরকমুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তা সম্পন্ন হয়।

এ পুস্তিকাটির শেষে পরিশিষ্টতে সংযোজিত হয়েছে ইমাম ইসমা'য়ীল আস-সান'য়ানী লিখিত (تطهير الاعتقاد) 'আকীদাঃ বিশুদ্ধীকরণ বই, এবং হিন্দুস্থানের বিখ্যাত 'আলেম ইমাম সিদ্দীক হাসান কনৌজীর ফাতাওয়ার কিছু প্রয়োজনীয় অংশ যা এ বইয়ের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরিশেষের পরিশিষ্টগুলো মূল বইয়ের বিষয়কে বিস্তৃত করেছে এবং জোরালো করে তুলেছে। আশা করি এ বইয়ের দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাইগণ উপকৃত হবেন এবং সঠিক 'আকীদাঃ সম্পর্কে ওয়াকীফহাল হবেন।

আল্লাহর কাছেই আমরা তাওফীক কামনা করি। তিনিই সৎপথের পথপ্রদর্শক এবং তাওফীকদাতা। সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই সব প্রশংসা এবং সালাত ও সালাম তাঁরই রাসূল মুহাম্মদের উপর, তাঁর পরিজনের উপর এবং সাহাবীদের উপর।

পক্ষ থেকে:

আল-মাসজিদুল হারাম-এর নির্দেশনামূলক দফতর

মাক্কাঃ আল-মুকাররমাঃ

ترجـــمة الإمام الشـــوكاني

ইমাম আশ-শাওকানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি হলেন 'আলেমদের ইমাম ফাদেল/সম্মানিত, ফাকীহ/চিন্তাবিদ, মুফাসসির/ব্যাখ্যাকারী, কাদী/বিচারক - মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী আস-সান'য়ানী। ১১৭৩ হিজরীর যুল-কা'য়দাঃ মাসে ইয়ামানের সানা'য়া শহরের অদূরে আশ-শাওকান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি কুরআন এবং শারী'য়তের বিভিন্ন শাখার বিষয়গুলো হিফয করেন যেমন- ফিক্হ ও এর উসূল, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি। তারপর তার পিতার সাথে তিনি সানা'য়া শহরে গমন করেন। বিভিন্ন 'উলামার মাজলিসে সব সময় উপস্থিত হয়ে তাদেও নিকট থেকে 'ইলম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষা দেয়া শুরু করেন এবং সাথে লেখালেখি ও ফাতাওয়া দেয়ার কাজও অব্যাহত রাখেন। তারপর তিনি কাদীর (বিচারক) পদ অলংকৃত করেন এবং চল্লিশ বছর ধরে সে পদে খেদমতের আঞ্জাম দেন। তার মৃত্যুর দু-বছর আগে তিনি কাদীর পদ থেকে ইস্তফা দেন।

তার মাজলিস সব সময় অধিক শিক্ষার্থী এবং ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মুখরিত থাকত। তার দারস থেকে প্রতিদিন তার শিক্ষার্থীরা শারী'য়তের বিভিন্ন শাখার দশাধিক দারস গ্রহণ করতেন। তার বিশেষত্ব হলো যে তিনি যায়েদী মাযহাবের (যা শিয়াদের এক ফিরকাঃ) 'উলামাদের উৎস হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুন্নী 'উলামাদেরও উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং তার তাফসীরের কিতাব, হাদীছের উসূলকে সকলেই গ্রহণ করেছেন। তার লেখনি সকল মুসলিমদের কাছে প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ।

আশ-শাওকানী লিখিত বইয়ের সংখ্যা হলো ২৭৮। এগুলোর মধ্যে ৩৮টি বই ছাপা হয়েছে। তার লিখিত বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ:

١ - فتح القدير ، في تفسير القرآن الكريم.

٢- إرشاد الفحول في علم الأصول.

٣- نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار.

٤- الدراري المضيّة.

٥- القول المفيد من أدلة الاجتهاد والتقليد.

٦- السيل الجرار على حدائق الأزهار.

٧- البدر الطالع بمحاسن القرن السابع.

٨- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.

ইমাম আশ-শাওকানী তার কর্মবহুল জীবনে পান্ডিত্যপূর্ণ লেখনিতে মুসলিম উম্মার সংস্কারে সহীহ 'আকীদার দিগনির্দেশনায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

১২৫০ হিজরীর জামাদী'উল আখের মাসে তার মৃত্যু হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের অশেষ খেদমতের জন্য আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং তাঁর অনন্ত করুণার মধ্যে তাকে সামীল করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন !!!

পক্ষ থেকে:

আল-মাসজিদুল হারাম-এর নির্দেশনা বিভাগ

মাক্কাঃ আল-মুকাররমাঃ

অনুবাদ ও সম্পাদনার কথা

মাক্কার হারাম শারীফের দফতর থেকে এ বইয়ের অনুবাদের জন্য যখন আমাকে দেয়া হয় তখন আমি সফরের প্রস্তুতিতে ভীষণ ব্যস্ত। তাই মাক্কাঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র কামারউদ্দীন পাটোয়ারীর উপর এর তরজমার দায়িত্ব দেই। সে সময় তিনি শেষ পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারই তড়িঘড়ি করে তরজমাকে ব্যাপক সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হলো। মূল তর্জমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করতে আমাদেরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল হান্নানের নিরলস পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে মহীউদ্দীন মুহাম্মদ জালালের ভাষা ও কম্পিউটার বিন্যাসের কারণে চটজলদী বইটি ছাপখানায় ঢুকতে পারল। জাযাহুমুল্লাহ খায়রান। অতি দ্রুততার কারণে তর্জমার ভাষা কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌছায়নি এবং তাতে অপ্রত্যাশিত ভুল ও অসঙ্গতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। হারাম শারীফের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অতিসত্ত্বর ছাপনোর তাগাদার কারণে বইটির কাজ তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হয়েছে। এ সংস্করণের কোন ভুল বা অসঙ্গতি পাওয়া গেলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে - ইন শাা আল্লাহ। পাঠকের কাছে অনুরোধ এ রকম কোন ভুল বা অসঙ্গতি দেখতে পেলে মেহেরবানী করে আমাদের জানালে তা বইটির ভবিষ্যত সংশোধন কার্যে সহায়তা করবে।

পরিশেষে হামদ ও শুকর জানাই সর্বনিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহর কাছে যার ফাদল, কারম ও রাহমাঃ ছাড়া আমাদের পক্ষে এ বইয়ের সত্বর তর্জমাঃ করা সম্ভব হতো না। তারপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মদের উপর, তার পরিবার-পরিজনের উপর, তার সাহাবীদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারী ও অনুগামীদের উপর।

شرح الصدور

للإمام العلامة

محمد بن علي الشوكاني

١١٥٠ هـ - ١٢٧٣ هـ

ترجمة إلى اللغة البنغالية ومراجعتها

الدار السلفية : مكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين وبعد :

জেনে রাখা ভাল যে মুসলিমদের মধ্যে যখন বিদ'য়াত, মাকরূহ, হালাল ও হারাম ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় তখন তা মীমাংসার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের আশ্রয় গ্রহণ ওয়াজিব। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র যুগ থেকে বর্তমান ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মুসলিম এ বিষয়ে একমত যে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে ধর্মীয় যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের কাছে সোপর্দ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿... فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ...﴾ (النساء-٥٩)

তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটলে তা পেশ করো আল্লাহ ও রাসূলের কাছে...। (সূরাঃ আন-নিসা - ৫৯)

আল্লাহর কাছে পেশ করার অর্থ তাঁর মহান কিতাবের আশ্রয় নেয়া। রাসূলের কাছে পেশ করার অর্থ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাতের আশ্রয় নেয়া। এটা এমনই এক ব্যাপার যাতে কোন মুসলিমেরই মতভেদ নেই। যখন কোন মুজতাহিদ বলেন: এটা হালাল, অন্যজন বলেন: হারাম, তখন বুঝতে হবে সত্য নিরূপণে তারা একে অপর থেকে যোগ্যতর নন যদিও বা তাদের মধ্যে কোন একজন অন্যের তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী, বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রবীণ। উভয়েই আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাঃ (সুন্নাত) মুতাবেক তিনি একজন 'ইবাদতকারী। অন্যান্য বান্দার কাছে আল্লাহর যা কাম্য তাঁর নিকটও ঠিক তাই

কাম্য। তার অর্জিত 'ইলম, ইজতিহাদের স্তরে উপনীত হওয়া বা সীমাতিক্রম পর্যায়ে পৌছে গেলেও তাঁর উপর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দার প্রতি আরোপিত কোন বিধি-নিষেধ রহিত হয়ে যায় না। বিধি আরোপকৃত বান্দাদের উর্ধ্বেও তিনি নন বরং 'আলেমের 'ইলম যতই বৃদ্ধি পায় তাঁর দায়-দায়িত্বও অন্যের তুলনায় সে অনুপাতে বেড়ে যায়। তা-ই যদি না হত তাহলে বান্দার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর বিধানাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাদের উপর চাপিয়ে দিতেন না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ (آل عمران- ١٨٧)

স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেনঃ তোমরা এটা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং গোপন করবে না।

(সূরাঃ আলে 'ইমরান - ১৮৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾ (البقرة- ١٥٩)

মানুষের জন্য যে সব স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও পথনির্দেশ আমি অবতীর্ন করেছি তা কিতাবে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও অভিশাপ দেয়। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ - ১৫৯)

আল্লাহ তা'য়ালা যাকে কিছু জ্ঞান দান করেছেন, তিনি যদি তা মানুষকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক বুঝিয়ে দিতে সক্ষম না হন, তাহলে

এ ব্যাপারে আমার উপরোক্ত বক্তব্যই যথেষ্ট অর্থাৎ 'আলেমগণ বিধি আরোপের গন্ডির বর্হিভূত নন। উপরন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে 'আলেমের দায়িত্বও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ করলে নির্বোধ পাপীদের তুলনায় তা কঠিনতর ও কঠোর শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে আর যে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অন্যায়ে লিপ্ত হয় উভয়ের কথাই আল্লাহ উল্লেখ করেছেন; এমনিভাবে কিছু আয়াতে অনেক ইয়াহুদী 'আলেমের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর আরোপিত বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করায় তাদের প্রতি পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল অথচ তাদের ছিল কিতাবী জ্ঞান, আর তারা তা শিক্ষাও করত। এ অন্যায় আচরণই তাদের জন্য ডেকে এনেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় তিরস্কারও করা হয়েছে।

সাহীহ হাদীছে বর্ণিত আছেঃ

((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَنَّ أَوَّلَ مَا تُسَعَّرُ بِهِ جَهَنَّمُ اَلْعَالِمُ اَلَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ وَلَا يَأْتَمِرُ وَ يَنْهَاهُمْ وَلَا يَنْتَهِي))

'আলেমদের দ্বারাই সর্বপ্রথম জাহান্নামে আগুন জ্বালানো হবে, যিনি মানুষকে আদেশ করতেন কিন্তু নিজে পালন করতেন না; তাদেরকে নিষেধ করতেন কিন্তু নিজে বিরত থাকতেন না।

মোট কথা, 'ইলমের আধিক্য ও পরিপূর্ণতা যতই উঁচু স্তরে পৌঁছুক, শার'য়ী বিধি বিধান কারো উপর থেকে মাওকুফ হয় না বরং কঠোরভাবে তা আরও বৃদ্ধি পায়। একজন 'আলেম এমনভাবে সম্বোধিত হন যা জাহেলকে করা হয় না। 'আলেমের দায়-দায়িত্ব অজ্ঞ লোকের দায়-দায়িত্ব থেকে ভিন্নতর। তার অপরাধ হয় কঠোর, শাস্তি হয় কঠিনতর। শার'য়ী 'ইলম সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা আছে সে এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীছগুলো একত্র করলে একটা বিরাট গ্রন্থের রূপ নেবে। আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - কিতাব ও সুন্নাঃ মুতাবেক 'ইবাদত করা ও

শার'য়ী বিধি-বিধান আরোপের ক্ষেত্রে 'আলেম ও জাহেল যে সমান তা বর্ণনা করা। আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু বিষয়ে 'আলেম ও জাহেলের মর্যাদা ও মাকামের পার্থক্য নির্ণয় করা। এর মধ্যে কিছু রয়েছে যা শুধু 'আলেমদের জন্যই প্রযোজ্য, জাহেলের প্রতি তা অপরিহার্যভাবে করণীয় নয়।

কোন বিষয়ে 'আলেম অথবা মুজতাহিদ ভুল করলে কারো জন্য তা অনুকরণ বা তার আনুগত্য করা জায়েয নয়

কিতাব ও সুন্নাঃ ভিত্তিক প্রমাণিত সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মত-বিরোধী 'উলামা ও তাদের অনুসারী, অনুগামীদের কারো পক্ষে একথা বলা জায়েয হবে না যে অমুক যা বলেছেন তা সঠিক। আর অন্যজন যা বলেছেন তা সঠিক নয়। অথবা অমুক ব্যক্তি অমুক অপেক্ষা সত্যিকার যোগ্যতর বরং তার যদি বিবেক, বিদ্যা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকে তাহলে বিতর্কিত বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য মনে করবে। যার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নার দলীল থাকবে তিনিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিতাব ও সুন্নার দলীল যার বিপক্ষে যাবে তিনিই ভুল। অবশ্য ইজতিহাদের দাবী পূরণ করে থাকলে তার কোন অপরাধ ধরা হবে না বরং তিনি অসমর্থ বিবেচিত হবেন। সাহীহ হাদীছ মুতাবেক তিনি বিনিময় প্রাপ্ত হবেন।

((...أنهُ إذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)) (متفق عليه)

কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদে সঠিক হলে তার জন্য দুটো প্রতিদান; ইজতিহাদে ভুল হলেও তার জন্য একটা প্রতিদান। (বুখারী ও মুসলিম)

যে ভুলের কারণে মুজতাহিদকে প্রতিদান দেয়া হবে সে ভুল এড়িয়ে চলতে হবে। অবশ্য প্রতিদান প্রাপ্তির ব্যাপারটি স্বয়ং মুজতাহিদেরই তিনি ভুল করে থাকেন। অন্যের জন্য এ ধরনের ভুলে তার অনুকরণ বা আনুগত্য করা জায়েয হবে না। কিতাব ও সুন্নাতের প্রমাণভিত্তিক সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 'আলেমদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ হলে কিতাব ও সুন্নাতের আশ্রয় নিতে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের দলীল যার পক্ষে থাকবে তিনি সত্যের সত্যেও সন্ধান পেয়েছেন; সত্যের অনুসারী ও অনুগামী হয়েছেন যদিও তিনি একজনই হোন। আর যার পক্ষে কিতাব ও সুন্নাতের দলীল নেই, (তাহলে বুঝতে হবে) তিনি সত্যের সন্ধানে সক্ষম হন নি বরং তিনি ভুল করেছেন যদিও তারা সংখ্যায় বেশী। ফলে কোন 'আলেম, শিক্ষার্থী বা অজ্ঞ লোকের পক্ষে একথা বলা অনুচিত যে, অমুক 'আলেমের কাছে সত্য আছে যদিও তার কাছে কোন দলীল নেই। এ ধরনের উক্তি চরম অজ্ঞতা, নিছক গোঁড়ামী ও সম্পূর্ণ ইনসাফ বহির্ভূত কারণ মানুষের দ্বারা সত্যের পরিচয় হয় না বরং সত্য দিয়ে মানুষের পরিচয়। কোন মুজতাহিদ, 'আলেম বা সত্যানুসন্ধিৎসু ইমাম নিষ্পাপ নন। যিনি নিষ্পাপ নন তাঁর পক্ষে ভুল ও নির্ভুল দুটোই হতে পারে। নির্ভুল কিছু বেরিয়ে আসতে পারে শুধু কিতাব ও সুন্নাতের নিরিখে ও যাঁচাইয়ের মাধ্যমে। কিতাব ও সুন্নাঃ যার পক্ষে তিনি সঠিক। এর বিপরীত হলে তার ইজতিহাদ ভুল। প্রথম ও শেষ, উত্তরসূরী ও পূর্বসূরী, ছোট ও বড়, সমস্ত মুসলিম এ কথায় একমত; কারো কোন দ্বিমত নেই। সামান্য বিদ্যার অধিকারীরও এটা জানার কথা। 'ইলমের কিঞ্চিতও যিনি জানেন তিনিও এটা বলতে পারবেন। আর যে এটা বুঝবে না এবং স্বীকার করবে না সে নিজেই যেন নিজেকে ভুলের মাঝে জড়িয়ে ফেলে। আর সে যেন জেনে রাখে যে অনধিকারচর্চাপূর্বক নিজের উপর সে অপরাধ বয়ে এনেছে। ক্ষমতার বাহিরে খোঁজাখুঁজি করে অনধিকার প্রবেশ করে অন্যায় করেছে। তার বুদ্ধি, জ্ঞান যেখানে কার্যকারী নয় সেক্ষেত্রে তার ভাষা ও কলম সংযত রাখাই তার

কর্তব্য। নিজকে ব্যাপৃত রাখতে হবে 'ইলমের অনুসন্ধানে; যা দিয়ে কুরআন-সুন্নাতের জ্ঞান লাভ ও অর্থ অনুধাবনে সহায়ক হবে। ফলে উভয় দলীলের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ের বিদ্যা অর্জিত হবে। সুন্নাঃ ও সুন্নাঃ-বিজ্ঞান চর্চায় ইজতিহাদ করবে। ফলে সাহীহ্ ও দুর্বল হাদীছে এবং গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য হাদীছের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্মানিত ইমামদের উক্তিতে গভীর দৃষ্টি দিবে যাতে তাঁদের কথার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। এর বিপরীত হলে অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের পূর্বেই যদি উক্ত অনধিকার চর্চায় মনোনিবেশ করে তাহলে বাড়াবাড়ির জন্য তাকে শোচনীয় অনুতাপ করতে হবে। অনর্থক কথা থেকে সংযত থাকতে হবে। অজ্ঞাত বিষয়ে দোষ-ত্রুটি খোঁজা-খুঁজি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কতই না সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছেন। সহীহ্ হাদীছে উল্লেখিত আছে:

((رَحِمَ اللهُ امْرَءًا قَالَ خَيْرًا أَوْ صَمَتَ)) (رواه البخاري)

সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন যে কথা বলে তো কল্যাণকর কথাই বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী)

আল্লাহ যার অন্তর প্রশস্ত করার পূর্বেই যে ব্যক্তি 'ইলমী বিষয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে যায় এ হাদীছটি ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে উল্লেখিত যারা 'আলেমদের পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে পড়ে। যে বিষয়ে জ্ঞান রাখে না, সে বিষয়ে সঠিক বলে না, কল্যাণকর কথা বলে না, নীরবও থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রদর্শিত শিষ্টাচার থেকে শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

পাঠক! উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার থেকে নিশ্চিত হয়েছেন যে মহান কিতাবের নির্দেশ মুতাবেক ও ইজমার ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের আশ্রয় গ্রহণ করা ওয়াজিব। আরো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে বিতর্কিত কোন বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্তকারী 'আলেমের পন্থা অবলম্বন করা বৈধ বলে যে ধারণা পোষণ করবে

সে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও উম্মাতের ইজমাঃ বা ঐক্যমতের বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাঠক দেখুন! এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজের উপর সে কতবড় অপরাধ করল? এ জঘন্য ভুলের কারণে কতবড় বিপদে পতিত হলো? কি মুসিবতই না টেনে আনলো। অনধিকার বিষয়ে মুখ খুলে কি কঠিন বিপদে নিজকে জড়িয়ে নিল! এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে 'আলেমদের মতবিরোধ এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের শরণাপন্ন হবার পদ্ধতি আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি যাতে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হতে পারে যে কার নিকট সত্য আছে আর কার নিকট ভুল আছে। এ থেকে আপনি ন্যায়কে সঠিকভাবে জানতে পারবেন। সত্য আপনার নিকট পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে কেননা উদাহরণের মাধ্যমে কোন কিছুকে উপস্থাপন করা হলে তা পূর্ণমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বচ্ছ বুদ্ধি ও সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তা অবগত আছেন। আর যার সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তব জ্ঞান বলতে কিছুই নেই তার জন্য তো এটা আরো বেশী কার্যকরী হবে।

যে সমস্যাটি উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু তা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। সেগুলো হলোঃ কবর উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ, মাসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা যা মানুষ আজকাল সচরাচর করে চলেছে। এ বিষয়ে এদেশের (ইয়ামেনের) লোকজন সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আলোচনায় বেশী আগ্রহী। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি: জেনে রাখা ভাল যে সাহাবাগণের যুগ থেকে অদ্যাবধি সমস্ত মুসলিম ঐক্যমতে পৌছেছেন যে কবর উঁচু করা, সেখানে কোন কিছু নির্মাণ করা এমন এক বিদ'য়াঃ (বিদ'য়াত) যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুশিয়ার বাণী রয়েছে। কোন মুসলিম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন নি। তবে কেবলমাত্র ইয়াহইয়া ইবনে হামযার একটি প্রবন্ধ থেকে বুঝা যায় যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবরে গম্বুজ ও দর্শনীয় কিছু নির্মাণকে তিনি দোষণীয় মনে করেন নি। তিনি ব্যতীত আর কারও কাছ থেকে এমন কথা পাওয়া যায় নি আর কেউই একথা

কর্তব্য। নিজকে ব্যাপৃত রাখতে হবে 'ইলমের অনুসন্ধানে; যা দিয়ে কুরআন-সুন্নাতের জ্ঞান লাভ ও অর্থ অনুধাবনে সহায়ক হবে। ফলে উভয় দলীলের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ের বিদ্যা অর্জিত হবে। সুন্নাঃ ও সুন্নাঃ-বিজ্ঞান চর্চায় ইজতিহাদ করবে। ফলে সাহীহ ও দুর্বল হাদীছে এবং গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য হাদীছের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্মানিত ইমামদের উক্তিতে গভীর দৃষ্টি দিবে যাতে তাঁদের কথার মাধ্যমে কাঙ্খিত বিষয়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। এর বিপরীত হলে অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের পূর্বেই যদি উক্ত অনধিকার চর্চায় মনোনিবেশ করে তাহলে বাড়াবাড়ির জন্য তাকে শোচনীয় অনুতাপ করতে হবে। অনর্থক কথা থেকে সংযত থাকতে হবে। অজ্ঞাত বিষয়ে দোষ-ত্রুটি খোঁজা-খুঁজি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কতই না সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছেন। সহীহ হাদীছে উল্লেখিত আছে:

((رَحِمَ اللهُ امْرَءًا قَالَ خَيْرًا أَوْ صَمَتَ)) (رواه البخاري)

সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন যে কথা বলে তো কল্যাণকর কথাই বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী)

আল্লাহ যার অন্তর প্রশস্ত করার পূর্বেই যে ব্যক্তি 'ইলমী বিষয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে যায় এ হাদীছটি ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে উল্লেখিত যারা 'আলেমদের পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে পড়ে। যে বিষয়ে জ্ঞান রাখে না, সে বিষয়ে সঠিক বলে না, কল্যাণকর কথা বলে না, নীরবও থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রদর্শিত শিষ্টাচার থেকে শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

পাঠক! উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার থেকে নিশ্চিত হয়েছেন যে মহান কিতাবের নির্দেশ মুতাবেক ও ইজমার ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের আশ্রয় গ্রহণ করা ওয়াজিব। আরো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে বিতর্কিত কোন বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্তকারী 'আলেমের পন্থা অবলম্বন করা বৈধ বলে যে ধারণা পোষাণ করবে

সে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও উম্মাতের ইজমাঃ বা ঐক্যমতের বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাঠক দেখুন! এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজের উপর সে কতবড় অপরাধ করল? এ জঘন্য ভুলের কারণে কতবড় বিপদে পতিত হলো? কি মুসিবতই না টেনে আনলো। অনধিকার বিষয়ে মুখ খুলে কি কঠিন বিপদে নিজকে জড়িয়ে নিল! এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে 'আলেমদের মতবিরোধ এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের শরণাপন্ন হবার পদ্ধতি আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি যাতে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হতে পারে যে কার নিকট সত্য আছে আর কার নিকট ভুল আছে। এ থেকে আপনি ন্যায়কে সঠিকভাবে জানতে পারবেন। সত্য আপনার নিকট পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে কেননা উদাহরণের মাধ্যমে কোন কিছুকে উপস্থাপন করা হলে তা পূর্ণমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বচ্ছ বুদ্ধি ও সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তা অবগত আছেন। আর যার সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তব জ্ঞান বলতে কিছুই নেই তার জন্য তো এটা আরো বেশী কার্যকরী হবে।

যে সমস্যাটি উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু তা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। সেগুলো হলোঃ কবর উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ, মাসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা যা মানুষ আজকাল সচরাচর করে চলেছে। এ বিষয়ে এদেশের (ইয়ামেনের) লোকজন সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আলোচনায় বেশী আগ্রহী। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলিঃ জেনে রাখা ভাল যে সাহাবাগণের যুগ থেকে অদ্যাবধি সমস্ত মুসলিম ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে কবর উঁচু করা, সেখানে কোন কিছু নির্মাণ করা এমন এক বিদ'য়াঃ (বিদ'য়াত) যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুশিয়ার বাণী রয়েছে। কোন মুসলিম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন নি। তবে কেবলমাত্র ইয়াহইয়া ইবনে হামযার একটি প্রবন্ধ থেকে বুঝা যায় যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবরে গম্বুজ ও দর্শনীয় কিছু নির্মাণকে তিনি দোষণীয় মনে করেন নি। তিনি ব্যতীত আর কারও কাছ থেকে এমন কথা পাওয়া যায় নি আর কেউই একথা

বলেন নি। ফিকাহ শাস্ত্রে যাইদিয়া (শিয়াদের একটি দল) সম্প্রদায়ের যে সব গ্রন্থকাররা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তা ইমাম ইয়াহইয়্যার উক্তি অবলম্বন ও পদাঙ্কানুসরণেই করেছেন। তাঁর সমসাময়িক বা পূর্বসূরী কারো কোন বক্তব্যে এ কথা আমি পাই নি। আহলে বাইত বলুন আর অন্য কারো কথা বলুন। যাইদিয়াদের উঁচু মানের উস্তাদ ও সে মাযহাবের উৎস, পারস্পরিক দ্বন্ধ নিরসন এবং অন্যদের ও নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মিমাংসাস্থল "আল-বাহর" গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর গ্রন্থে এটুকুই উল্লেখ করেছেন। তার ফিকহী সংক্রান্ত অধিকাংশ মাসায়েলই মুজতাহিদীনদের উক্তি নির্ভর।

ফিকহী মাসয়ালায় মতভেদ ও তা প্রমাণ বা প্রত্যাখানের ব্যাপারে এ যুগে এ দেশে মুজতাহিদীনের মতামত জানতে চাইলে যারা তার ঐ মূল্যবান গ্রন্থের শরণাপন্ন হয় তাদেরকে বলি: গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবরে গম্বুজ ও দর্শনীয় কিছু নির্মাণ সম্বলিত প্রবন্ধটি শুধুমাত্র ইমাম ইয়াহইয়্যার বলেই উল্লেখ করেছেন। যার উদ্ধৃতি এইরূপ: বিনা প্রতিবাদে মুসলিমদের কৃত 'আমল বা ব্যবহারের ও অভ্যাসের ফলে রাজা-বাদশা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কবরে গম্বুজ স্থাপন ও অলংকরণ করা অশোভন নয়- সংক্রান্ত ইমাম ইয়াহইয়্যার মাসয়ালা"।

পাঠক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে এ কবর সংক্রান্ত মাসালায় ইমাম ইয়াহইয়্যা ছাড়া আর কারো সম্মতি নেই। তিনি প্রামাণ্য হিসাবে যা দাড় করিয়েছেন তা হচ্ছে "বিনা প্রতিবাদে জনসাধারণের 'আমল বা ব্যবহার।" এরপর "আল-বাহর" প্রণেতা "আল-গাইছ" নামক অন্য গ্রন্থে ইমাম ইয়াহইয়্যার পেশকৃত প্রমাণটি উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হয়েছেন আর কিছু উল্লেখ করেন নি। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে এ বিরোধের একপক্ষে শুধু ইমাম ইয়াহইয়্যা এবং অপরপক্ষে সাহাবা, তাবে'য়ীন, আহলে বাইত, পরবর্তী মাহযাব চতুষ্টয়ের প্রবর্তক, প্রথম ও শেষ সব মুজতাহিদীনসহ সব 'ওলামাগণ রয়েছেন।

ইমাম ইয়াহইয়্যার পর নতুন কোন লেখকের গ্রন্থে তাঁর উক্তি বিবৃত অবস্থায় পাওয়া গেলেও এ লেখকগণ উক্ত 'আলেমদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বলে ধরে নেয়া যাবে না কারণ শুধু উক্তি উদ্ধৃত করায় উদ্ধৃতকারী তা গ্রহণ করেছেন বা স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে প্রমাণ হয় না। ইমাম ইয়াহইয়্যার পর যদি কোন 'আলেমকে তাঁর সপক্ষে বলতে শোনা যায় আর তিনি যদি মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে ইমাম ইয়াহইয়্যার সুরেই তিনি কথা বলেছেন। তার পেশকৃত বক্তব্য দলীলসম্মত নয়। আর তিনি মুজতাহিদ না হলে তা সমর্থন ও গ্রহণযোগ্য নয় কেননা গ্রহণযোগ্য তো শুধু মুজতাহিদের বক্তব্য, অনুসারীদের নয়।

আপনি যদি জানতে ইচ্ছা করেন যে, ইমাম ইয়াহইয়্যার বক্তব্য সঠিক নাকি অন্য 'আলেমের বক্তব্য সঠিক তাহলে এর মীমাংসার জন্য আপনাকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মাপকাঠিতে যাচাই করতে হবে। আপনি বলতে পারেন: আমাদেরকে সে পদ্ধতি বলে দিন যা সত্য নিরূপণে অর্থবহ ভূমিকা পালন করবে সাথে সাথে এ মাসায়ালায় সঠিক ইজতিহাদ আর ভুল ইজতিহাদও নির্ণয় হয়ে যাবে। তাহলে শুনুন বলছি: আমার বক্তব্য শুনার জন্য কানও খোলা রাখুন, বিবেক সজাগ রাখুন আর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে চিন্তা করুন। আমি এখানেই উপস্থিত থেকে আকাঙ্খিত পদ্ধতির বিশ্লেষণ দিচ্ছি। ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার পর আপনার নিকট আর কোন সন্দেহ স্থান পাবে না: আপনার জ্ঞান ও মেধায় অস্পষ্টতার সংমিশ্রণও হবে না । (ইন শা-আল্লাহ)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ... ﴾

(الحشر- ٧)

রাসূল তোমাদিগকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরাঃ আল-হাশর -৭)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহর রাসূল যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা বান্দার জন্য অত্যাবশ্যকভাবে করণীয় ও গ্রহণীয়। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক।

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾

(آل عمران- ٣١)

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকেও ভালবাসবেন...। (সূরাঃ আলে-'ইমরান : ৩১)

এ আয়াতে প্রত্যেক বান্দার উপর আল্লাহর অবধারিত ভালবাসাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র ভালবাসার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহর ভালবাসাকে বান্দার সাথে যুক্ত করা হয়েছে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণের সাথে। এটাই যদি আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালবাসার মাপকাঠি হয় তো সাথে সাথে বান্দার পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির উপায়ও বটে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ... ﴾ (النساء- ٨٠)

যে রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল..।
(সূরাঃ আন-নিসা-৮০)

এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলের আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য ।

আল্লাহ তা'য়ালা অনত্র বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ﴾ (النساء- ٦٩)

আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের: নাবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত না উত্তম সংগী !

(সূরাঃ আন-নিসা - ৬৯)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে আনুগত্য করবে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। এহেন সৌভাগ্যবান বান্দা আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণী ও সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সাহচর্যে অবস্থান করার সুযোগ পাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾ (سورة النساء)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল এবং এটাই মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরাঃ আন-নিসা - ১৩-১৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ (سورة النور)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা অনুসরণ করে আর আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে তারাই সফলকাম। (সূরা আন-নূর - ৫২)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

﴿...أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ...﴾ (النساء- ٥٩)

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের...।
(সূরাঃ আন-নিসা - ৫৯)

আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾﴾ (سورة آل عمران)

সুতরাং তোমারা আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।
(সূরাঃ আলে-'ইমরান - ৫০)

এ ধরনের প্রামাণ্য দলীল হিসেবে কুরআনুল কারীমে প্রায় ত্রিশের অধিক আয়াত রয়েছে। উক্ত আলোচনা থেকে এ জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা গ্রহণ ও অনুকরণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মতই অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য। আর আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশেরই নামান্তর।

উঁচু কবর ও এর উপরে কিছু নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা এবং কবরের উঁচু অংশ ভেঙ্গে সমতলকরণ অপরিহার্য - সংক্রান্ত হাদীছ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত সাহীহ হাদীছ আপনাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি। তার পূর্বে ভূমিকা ও অবতরণিকাস্বরূপ কিছু বিষয় প্রারম্ভিকভাবে উল্লেখপূর্বক প্রাসঙ্গিক বিষয় শেষ করব যাতে পাঠক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কবরে গম্বুজ ও প্রতীক নির্মাণ নিয়ে ইমাম ইয়াহইয়্যা ও অন্যান্য 'আলেমকুলের বক্তব্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের শরণাপন্ন হতে হবে কারণ মহান আল্লাহ সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে পাঠক একটা কুল-কিনারা পাবেন, হতে পারবেন পরিতুষ্ট। প্রত্যেক জ্ঞানী লোকের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কবর উঁচু করা এ উম্মতের জন্য বিরাট গোলযোগ, বিশৃংখলা ও চরম পর্যায়ের শয়তানী

ষড়যন্ত্র। 'আদ জাতিরাও এমন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর মহান কিতাবে তা বিবৃত করেছেন। এ ব্যাপারে নূহ 'আলাইহিস সালামের জাতি ছিল সর্বাগ্রে।
আল্লাহ তা'য়ালা জানাচ্ছেন:

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ ﴾ (نوح)

নূহ বলেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতিরা আমার বিরোধিতা করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার সম্পদ ও সন্তান তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নি। ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরাঃ নূহ- ২৩)

আদম সন্তানদের মধ্যে তারা ছিল পুণ্যবান জাতি। তাদের ছিল অনেক অনুসারী যারা তাদের পদাঙ্কনুসরণ করে চলত। এঁদের ইন্তেকালের পর অনুসারীরা বলতে লাগল, "*আমরা যদি ঐ পুণ্যবানদের চিত্র তৈরি করে স্মরণ করি তাহলে 'ইবাদতের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পাবে।*" অনুসারীরা তাদের ছবি আঁকল। কালক্রমে এদের ইন্তেকাল হল এবং এদের স্থলে অন্যরা আসল। শয়তান সূক্ষ্মভাবে এসে বলল: "*অনুসারীরা তো ঐ পুণ্যবানদের 'ইবাদত করত। পুণ্যবানরা বৃষ্টি বর্ষণ করতেন।*" এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী অনুসারীরা পূর্ববর্তী অনুসারীদের 'ইবাদত আরম্ভ করে দিল। তারপর এদের অনুকরণে অন্যান্য 'আরববাসীরাও তাদের 'ইবাদতে শামিল হতে থাকলো।

সাহীহ বুখারী শরীফে ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে এর সমর্থনে হাদীছ বর্ণিত আছে।

পূর্বসূরি কিছু সম্প্রদায়ের বক্তব্য: "এরা ছিলেন নূহ গোত্রীয় পুণ্যবান সম্প্রদায়। তাদের ইন্তেকালের পর অনুসারীরা (ভক্তরা) তাদের কবরে অবস্থান শুরু করে দিল। তারপর তাদের প্রতিমূর্তি চিত্রায়িত করার পর দীর্ঘায়ু লাভ করে তাদেরই 'ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেল।"
(বুখারী)

এই কথার সমর্থনে 'আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা)র এক বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শারীফসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

"উম্মে সালমাঃ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) ইথিওপিয়ায় অবস্থানকালে স্বচক্ষে দেখা এক গির্জায় প্রদর্শিত প্রতিমূর্তির কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কাছে বলেছিলেন। সে কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সৎলোকের মৃত্যু হলে ওরা তার কবরে মাসজিদ নির্মাণ করতো আর সেই মাসজিদে ঐ পুণ্যবান ব্যক্তির ছবি/প্রতিমূর্তি স্থাপন করত। এরাই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"

ইবনে যারীর তার তাফসীরের মধ্যে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন:

﴿...أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۝﴾ (سورة النجم)

... তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত উযযাঃ সম্বন্ধে। (সূরাঃ নাযম- ১৯)

এ আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন: এভাবেই তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের কবরের কাছে অবস্থান করত।

কবরে উপর কিছু নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার দলীল

সাহীহ মুসলিম শারীফে যুনদুব বিন 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মৃত্যুর পূর্বে বলতে শুনেছি:

"সাবধান! তোমাদের পূর্বে যে জাতি ছিল তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদতুল্য মনে করত। খবরদার! তোমরা কবরকে মাসজিদে পরিণত করো না: তোমাদেরকে তা করতে আমি নিষেধ করছি।"

বুখারী ও মুসলিম শারীফে বর্ণিত হাদীছে 'আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"ইয়াহুদী-নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"

তাদের কর্মকান্ড থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করে দিতেন।

বুখারী ও মুসলিম শারীফে ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-র অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-র বর্ণিত একটি হাদীছ এরূপ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। তারা নাবীদের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সাহীহাইনে 'আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) অন্য একটি বর্ণনায় বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ অসুস্থতাবস্থায় বলেছেন: "ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত! তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মাসজিদে পরিণত করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

যদি তা-ই না হতো তো তিনি নিজের কবরের জায়গাটি দেখিয়ে দিতেন। মাসজিদ বা সিজদার স্থানে পরিণত হয়ে যায় কিনা এই আশঙ্কায় তা করেন নি।

ইমাম আহমাদ (রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-র উত্তম সনদ সম্বলিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে: "নিকৃষ্টতম মানুষ তারা যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত ঘটবে এবং যারা কবরকে মাসজিদ রূপে গ্রহণ করবে।"

ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য হাদীছ বিশারদগণ যাইদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-র হাদীছ সংকলন করেছেন।

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কবর যিয়ারতকারিনী, কবরে মাসজিদ নির্মাণকারী ও সেখানে আলোক সজ্জাকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

আবুল হাইয়াজ আসাদীর সনদে সাহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত: তিনি বলেন: 'আলী ইবনে আবূ তালেব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) আমাকে বলেছিলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যে মিশনে প্রেরণ করেছিলেন, আমি কি সে মিশনে তোমাকে না পাঠিয়ে পারি? মিশনটি ছিল যে: প্রতিটি প্রতিমা নিশ্চিহ্ন

করা এবং একটা উঁচু কবরও মাটির সাথে সমান করা ব্যতীত আমি যেন ফিরে না আসি।"

ছুমামাহ বিন শুফাই থেকে সাহীহ মুসলিমে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। বৈধ পরিমাপ ছাড়া অতিরিক্ত উঁচু প্রত্যেক কবরকে অপরিহার্যভাবে সমতল করে দেয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোতে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিগনির্দেশনা রয়েছে। কবরের পাশে দেয়াল, এর উপরে কিছু নির্মাণ, গম্বুজ নির্মাণ ও মাসজিদ নির্মাণ এসবই কবর উঁচু করার আওতাভূক্ত আর এ সব কাজ একেবারেই নিষিদ্ধ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উঁচু অংশ নিশ্চিহ্ন করার জন্য 'আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর 'আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) ও তাঁর খিলাফতকালে আবুল হাইয়াজ আসাদীকে উঁচু কবর ভেঙ্গে দেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজী ও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুমুল্লাহু তা'য়ালা) জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত একটি হাদীছ সংকলন করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান তা সত্যায়ণ করেছেন। তিনি বলেন: *"কবরে দেয়াল নির্মাণ, মোজাইক ও মসৃণ করতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।"* ইমাম মুসলিম ছাড়া অন্যরা কিছু লিখতেও নিষেধ করেছেন। ইমাম হাকেম বলেন: কবরে কিছু লেখার নিষেধাজ্ঞাটা ইমাম মুসলিমেরই শর্ত সাপেক্ষে। এ হাদীছটি সাহীহ ও গারীব। এসব হাদীছে কবরের উপর দেয়াল নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। কবরের গর্তের আশেপাশে কিছু নির্মাণ করলেও তা এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

মৃত ব্যক্তির কবরকে সাধারণতঃ এক হাত বা ততোধিক উচ্চতায় স্থাপন করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার জন্য কবরকে মাসজিদে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই কবরের চতুর্পাশ্বে কিছু নির্মাণ করলে তা নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না – এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কবরের চারপাশে কিছু নির্মাণ করে।

কবর সংলগ্ন বা সন্নিকট বলতে যা বুঝায় তা কবর গর্তের আশপাশ যেমন ধরুন কবর ঘিরে সুউচ্চ গম্বুজ, অনেক মাসজিদে সমাবেশস্থলে এমনভাবে নির্মিত যে কবরটি ঠিক মধ্যস্থলে অথবা অভ্যন্তরেই যে কোন এক পার্শ্বে অবস্থিত। সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও বুঝবে যে এগুলো কবরের উপরই নির্মাণ যেমনটি বলা হয়ে থাকে: বাদশা শহরে বা গ্রামে দেয়াল নির্মাণ করেছেন। অথবা বলা হয়ে থাকে যে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে মাসজিদ নির্মাণ করেছেন অথচ দেয়ালের অংশ ঐ শহর, গ্রাম বা স্থানের সাথে সরাসরি লেগে নেই; তার পার্শ্বস্থ যায়গাটি লেগেছে মাত্র। যে পার্শ্বে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সে স্থানটি মূল মধ্যস্থলের নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক তাতে কোন তফাৎ নেই। ছোট শহর, গ্রাম বা সঙ্কীর্ণ স্থানে নির্মিত হলে দেয়াল কাছাকাছি আর বড় শহর, গ্রাম বা প্রশস্থ যায়গায় হলে দূরবর্তীতে অবস্থিত মনে হয়। 'আরবী ভাষায় এমন ব্যবহার চলেনা; আর যে তা করে সে 'আরবী ভাষার বাক-বিধি কিছুই বুঝে না। 'আরবী বাক্যে কি ব্যবহার হয়েছে তাও সে জানে না।

এটাই যখন সুনিশ্চিত বলে পাঠক জানতে পেরেছেন তাহলো কবরের উপর গম্বুজ, মাসজিদ, বৈঠক খানা ও উঁচুকবর নির্মাণকারী ইত্যাদি নির্মাতার বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল অভিশম্পাত করেছেন। কখনো উপরোক্ত ভাষায় বলেছেন। আবার কখনো উচ্চারণ করেছেন:

"আল্লাহর গজব কঠিন হোক ঐ জাতির উপর যারা নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"

তাদের এ ধরনের কৃত অপরাধের কারণে আল্লাহর শাস্তি কঠোর হবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল বদদোয়া করেছেন। সাহীহ হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত।

কখনো তিনি তা নিষেধ করেছেন সরাসরি। কখনো তা ধ্বংস করার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। আবার এ কাজকে ইয়াহুদী নাসারাদের কাজ বলে অভিহিত করে বলেছেন:

"তোমরা আমার কবরকে প্রতিমাঘর বানাবে না। অন্যভাবেও বলেছেন যে, তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না।"

অর্থাৎ মৌসুমী সমাবেশস্থল বানাবে না; যেমনটি বহু কবরপূজারীরা বাৎসরিক ওরোসের নামে করে আসছে। কবরপূজারীরা মৃত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত সময়ে (নির্দিষ্ট মৌসুমে) কবরের কাছে সমবেত হয়ে কবরের 'ইবাদত (সদৃশ্য কাজ) করে থাকে; সেখানে কিছু সময় অবস্থান করে। এদের ঘৃণিত কর্মকান্ড সব মানুষেই জানে। এ সব অকৃতজ্ঞ লোক মহান আল্লাহর 'ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে - যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে মৃত্যু দিবেন এবং পুনরুজ্জিবীত করবেন।

তারা এমন বান্দার 'ইবাদত করে যে মাটির নিচে চলে গেছে। নিজের কোন উপকার করতেই সে অক্ষম ক্ষতি থেকেও আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন:

"বল আমি আমার নিজের লাভক্ষতি কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না।"

(আল-কুরআন)

দেখুন! আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানব এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু কিভাবে ঘোষণা দিলেন যে তিনি নিজের পক্ষে কোন লাভ-ক্ষতি কিছুই করার মালিক নন। সাহীহে হাদীছে আল্লাহর রাসূল আরও বলেছেন:

"হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা! শুনে রাখ! আল্লাহর নিকট আমি তোমার কোনই কাজে আসবো না।"

এটাই যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামে)'র নিজের সর্বাধিক প্রিয় কন্যা ফাতেমার ব্যাপারে ঘোষণা হয় তাহলে অনুমান করুন সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কী হতে পারে? যারা কোন নাবী ছিলেন না, প্রেরিত রাসূলও নয় অধিকন্তু মৃত ব্যক্তিরা উম্মতে মুহাম্মদীর একজন সদস্য ও কবরবাসী মাত্র। সর্বাধিক অর্থে তারা কিছু করতে অক্ষম। উম্মতের উপকার বা অপকার বা

কোন কিছু করতে কবরবাসী অসমর্থ। আর তা হবে না কেন যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং নিজের কন্যার ব্যাপারে অক্ষম। তিনি তাঁর অক্ষমতার ব্যাপারটি উম্মাতকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন; আল্লাহও জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি মানব জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেবার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে: তিনি নিজের কোন উপকার ও অপকার কিছুই করার মালিক নন। তাঁর প্রিয়তম কন্যাকেও আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কোন কাজে আসবেন না। অথচ কবরস্থিত মৃত ব্যক্তির অনুসারী ও ভক্তরা (তাদের থেকে উপকার ও অপকারের) আশা করে থাকে। কবরপূজারীরা যে ভ্রান্তে নিমজ্জিত রয়েছে এর থেকে চরম ভুল ও ভ্রান্তি আপনি শুনেছেন কি কখনো?

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (سورة البقرة)

আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (আল-বাকারঃ ১৫৬)

কি আশ্চার্য্য ব্যাপার! যার ন্যূনতম জ্ঞান নেই, 'ইলমের সঠিক তত্ত্বজ্ঞানে যার সামান্যতম অংশও নেই কিভাবে সে প্রত্যাশা করতে পারে যে নাবীর একজন সাধারণ উম্মত তার উপকার বা ক্ষতি সাধন করার অধিকার রাখে? অথচ ঐ নাবীর নিজস্ব ব্যাপারে তার উপরোক্ত উক্তি কি যথেষ্ঠ নয়?

'আদ-দুররুন্নাদীদ ফী ইখলাছি কালিমাত তাওহীদ' নামক আমার একটি গবেষণালব্ধ বইয়ে এ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গতর ব্যাখ্যা দিয়েছি। বইটি পড়ার জন্য পাঠক সমাজের কাছে অনুরোধ রইল।

কবরের গম্বুজ, আড়ম্বর ও মহিমা এবং তা পর্দাবৃত দেখে নির্বোধ লোকেরা শিরকে লিপ্ত ও প্রতারণার শিকার হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে মৃতদের ব্যপারে যে ধারণা গড়ে উঠেছে যা শয়তান মানুষের সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে তাহলো কবর উঁচু করা, তা মোজাইক করা, পূর্ণরূপে সজ্জিত করা, অলংকরণ ও পর্দায় আচ্ছাদিত করা। গম্বুজবিশিষ্ট, কারুকার্যখচিত কবরের প্রতি যখনই নির্বোধ লোকের দৃষ্টি পড়ে, তখন সে সেখানে প্রবেশ করে। তারপর দেখে সেখানে ঝুলছে মনমাতানো পর্দা, উজ্জল ঝাড়বাতি, আগর লোবানের বিচ্ছুরিত সুঘ্রাণ, কবর ঘেরা জ্যোতি - এসব দেখে ঐ কবরের মহিমা ও সম্মান তার অন্তর ভরে যায়। আর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা কল্পনা করতেই তার বিবেক ক্ষীণ হয়ে আসে, তার হৃদয়ে প্রবেশ করে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। এভাবে তার মনে প্রোথিত হয় শয়তানী ধ্যানধারণা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে শয়তানের এটা মহা-ষড়যন্ত্র এবং বান্দার পথভ্রষ্ট হওয়ার শক্তিশালী পন্থা যা ধীরে ধীরে মুসলিমকে ইসলাম থেকে পদস্খলন ঘটায়। তারপরে এমন পর্যায়ে নিয়ে পৌছায় যে তারা কবরবাসীদের কাছ থেকে এমন কিছু আশা করে যা আল্লাহ ছাড়া আর কারোই দেবার ক্ষমতা নেই ফলতঃ সে মুশরিকদের দলভূক্ত হয়ে যায়। সুসজ্জিত কবরের প্রতি প্রথম দৃষ্টি ও প্রথম দর্শনই শিরকের সূত্রপাত হয়ে যায় কেননা এ ধরনের মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের ভাবগম্ভীর আচরণ ও মনযোগ ইহকালীন অথবা পরকালীন যে কোন আকাঙ্খিত সুবিধাপ্রাপ্তির জন্যই হতে পারে ভেবে তার অন্তরে দোলা দিয়ে উঠে। কবরে অবস্থানরত 'আলেম সদৃশ কোন ব্যক্তিকে দেয়াল চুম্বন ও যিয়ারত করতে দেখে তার তুলনায় নিজকে অধিক হেয় মনে করতে থাকে।

নির্বোধদের সম্পদ ভক্ষণের উদ্দেশ্যে কবর রক্ষণাবেক্ষণের কৌশল

শয়তান মানুষের একটা দলকে নিয়োগ করে রাখে যারা ঐ কবরস্থানে অবস্থান করে। যিয়ারতকারী আগন্তুকের সাথে তারা প্রতারণা করে থাকে। আগন্তুকদের সম্মুখে ব্যাপারটিকে তারা ভয়ঙ্কররূপে উপস্থাপন করে। এমনকি মনগড়া কিছু বানিয়ে মৃত ব্যক্তিদের নামে চালিয়ে দেয়। নির্বোধের দল তা ভাবতেও পারে না। আবার কখনো দেখা যায় যে অসত্য কাহিনী রচনা করে মৃত ব্যক্তির "কারামত" নামকরণ করে জনসমাজে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। নিজেদের আড্ডাখানায় ও জনসমাবেশে বারংবার আলোচিত, প্রচার ও প্রসারে ব্যাপকতা আনে। মৃত ব্যক্তিদের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিরা তা সহজেই গ্রহণ করে নেয়। তাদের পক্ষ থেকে অসত্য বা মনগড়া যা-ই বিবৃত হয় এদের বিবেক সুন্দরভাবে তা গ্রহণ করে নেয়। যা শুনে তা-ই প্রচারে লিপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা করে। কবরের অন্ধপূজারীরা তখন শিরকের নিপাতিত হয়। নিজেদের মূল্যবান ও উত্তম সম্পদগুলো মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করে। সর্বাধিক প্রিয় সম্পদকেও কবরের নিকট দায়বদ্ধ রাখে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে ঐ মৃত ব্যক্তির প্রভাব ও খ্যাতির সুবাদে লাভ করবে মহামঙ্গল আর উত্তম প্রতিফল। তাদের আরও বিশ্বাস যে এটা একটা মর্যাদাপূর্ণ নৈকট্য, সঠিক 'ইবাদত, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নেক 'আমল। শয়তানের দোসর ঐ সব মানুষের দ্বারাই এসব উদ্দেশ্য সাধিত হয় যারা আগে থেকেই ঐ কবরের সেবায় নিয়োজিত কেননা কীর্তিগুলো তো তারাই ভয়ঙ্কররূপে পেশ করেছিল এবং তারাই ব্যাপারটাকে ভীতিপদ করে তুলেছিল। অসত্য কাহিনী রচনা করে তারাই প্রচার করেছিল। তারা এসব করেছিল শুধু নির্বোধ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের তুচ্ছ সম্পদের উচ্ছিষ্ট লাভের আশায়।

এ অভিশপ্ত পন্থায় ও ইবলিসী পদ্ধতিতে কবরে সম্পত্তি ওয়াকফ করার সংখ্যা বেড়ে চলেছে ভয়ঙ্কর গুণিতক হারে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে তাদের ওয়াকফকৃত সম্পদের সমষ্টি একটি বৃহত্তর মুসলিম জনপদের খোরাকের সমপরিমাণ। পুঞ্জিভূত সম্পদ যদি

বিক্রি করা যেত তাহলে তা বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ তা যথেষ্ট করে দিতেন অথচ এর পুরোটাই আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে মানত/নযর করা হয়েছে।

সাহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মানত/নযর করা যাবে না।

আর এটা এমন এক মানত/নযর যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা যায় না বরঞ্চ ঐ মানতকারীরা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কেননা এ ধরনের মানতকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদেরকে উপাস্যের ধারণা করে থাকে- যা তাওহীদের বুনিয়াদকে কাঁপিয়ে দেয়। মানতকারী তার সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ কবরে মানত করা মাত্রই শয়তান তার অন্তরে ঐ কবর ও কবরবাসীর প্রতি প্রেম, ভালবাসা, মহত্ব, মহিমা ও ভক্তির বীজ বপন করে দেয় ফলে কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস তাকে সুশীতল ইসলামের নিরাপদ পথে দিকে আর ফিরে আসতে দেয় না। এ ধরনের লাঞ্ছনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ প্রতারিত ও প্রবঞ্চিতদেরকে কেউ যদি আল্লাহর 'ইবাদত ও নৈকট্য লাভের মানত করতে অনুরোধ করে যা সে কবরের কাছে মানত করে সে তা করবে না; তার কাছেও যাবে না। দেখুন! শয়তানের খেলা এদের সাথে কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে? কিভাবে এদেরকে নিক্ষেপ করেছে অন্ধকার বেষ্টিত অতল গহ্বরে? অবশেষে কবর উঁচু করা, সুদৃঢ় করা, মোজাইক করা, মসৃণ করা ইত্যাদি কারণে সৃষ্টি হয় গোলযোগ ও বিশৃংখলা।

উঁচু কবর নির্মাণের ভিত্তিতে সৃষ্ট গোলযোগের ধারাবাহিকতা ও সেখানে যবাই অনুষ্ঠান।

কোন কোন ফিৎনা-ফাসাদ এমন চরম পর্যায়ে পৌছে যে ঐ ফিৎনা-ফাসাদকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীনের সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। কবরপূজারীদের অনেকেই নিজস্ব

মালিকানাধীন সুন্দরতম ও সর্বোত্তম গবাদি পশু নিয়ে কবরবাসীর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে কবরের পাশেই যবেহ করে। আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্য নামে যবেহ করে। এর দ্বারা তারা প্রতিমারই পূজা করে কেননা প্রতিমা নামের নির্জীব পাথরের উদ্দেশ্যে কুরবানী ও কবরে অবস্থিত মৃত ব্যক্তির পূজার মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ নেই। নামকরণের ভিন্নতায় সত্তা বিলোপ হয় না। নামের এ পার্থক্যে হারাম-হালালেও প্রভাব পড়ে না কারণ কোন ব্যক্তি মদকে অন্য নামে পান করলে মদ্যপানের বিধানই তার উপর প্রযোজ্য হবে। চাই সে যে নামেই নামকরণ করুক? কোন মুসলিমের এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

জবেহ করা নিঃসন্দেহে আল্লাহর 'ইবাদত। যেমন- কুরবানী করা, হাদ্‌ঈ, ফিদইয়াঃ ইত্যাদি। বস্তুত কুরবানী দ্বারা কবরবাসীর নৈকট্য লাভ এবং কবরের পার্শ্বে পশু যবেহকারীর উদ্দেশ্যই হচ্ছে: কবরের মহত্ব ও মর্যাদা ব্যক্ত করা; অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করা এবং এ থেকে নিজের জন্য মঙ্গল টেনে আনা আর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা। যবাহ্ যে 'ইবাদত এতে সন্দেহ নেই। আর এর মন্দ যে এতই খারাপ তা শুনাই ভাল।

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যুল আজীম।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম বলেছেন:

قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا عقر في الإسلام))

"ইসলামে কোন বলী নেই।"

আব্দুর রাজ্জাক বলেন: তারা কবরের কাছে গরু বা বকরী বলী দিত।

ইমাম আবূ দাউদ আনাস বিন মালিক হতে বিশুদ্ধ সনদে এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

خاتمة البحث/পরিশিষ্ট

উপরে যে দলীল সমৃদ্ধ নির্দেশনামূলক আলোচনা করেছি এবং পরিশিষ্টতে যে আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি তা কবর বিষয়ক সমস্যার পূর্ণ মীমাংসা হবে। বুলন্দ কণ্ঠে আহবান দিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে যাবে; উজ্জ্বল তথ্যাবলি নিয়ে হাজির হবে।

'আল-বাহর' রচয়িতা তাঁর গ্রন্থে ইমাম ইয়াহইয়্যার যে উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন তা 'আলেম সমাজের সাধারণ ভুলত্রুটির মতোই একটি ভুল। মুজতাহিদীন থেকে এমন ভুল হয়েই থাকে। এটাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা। একেবারে নিষ্পাপ তো কেবল তিনিই হতে পারেন যাকে আল্লাহ তা'য়ালা রক্ষা করেন। একজন মুজতাহিদ দীনদারীর দিক থেকে উঁচুমানের 'আলেম, সত্য উদঘাটনে সর্বাধিক গবেষক, পথপ্রদর্শক ও প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক 'আলেমই তাঁর বক্তব্য গ্রহণ ও বর্জন দুটোই করতে পারে। কিন্তু আমরা যখন দেখলাম কবরে গম্বুজ নির্মাণের ব্যাপারে ইমাম ইয়াহইয়্যা ব্যতীত প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে তখন এ বিতর্ক নিরসনের জন্য আমরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের দিকে সোপর্দ করলাম। সেখানে আমরা পেয়েছি প্রমাণভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা এবং এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠের কঠোর নিষেধাজ্ঞা। এ সব যে করে তার জন্য রয়েছে অভিশাপ, লাঞ্ছনা ও বদদোয়া এবং আল্লাহর প্রচন্ড ক্রোধ। এটা ইসলাম থেকে বহিস্কার হওয়ার পন্থা ও শিরকের প্রতি ধাবিত হওয়ার নিশ্চিত মাধ্যমও। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

ইমাম ইয়াহইয়্যার সমর্থনে যদি কোন কোন ইমাম বক্তব্য দিয়ে থাকে তো তাঁদের বক্তব্য উল্টো তাদের দিকেই ফিরে যাবে। বক্ষমান নিবন্ধের প্রারম্ভেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। সাহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

(رواه البخاري)

"প্রত্যেক (ধর্মীয়) বিষয়ে যার উপর আমার কোন আদেশ নেই তা পরিত্যক্ত।"

কবর উঁচু করে তৈরি করা, কবরের উপরে সৌধ নির্মাণ, গম্বুজ বা মাসজিদ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র অনুমোদন নেই। এর স্বপক্ষের উক্তি তারই বিরুদ্ধে যাবে যিনি মানবজাতির কল্যাণার্থে শরী'য়াত প্রবর্তন করেছেন- তিনি হচ্ছেন মহান প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি তাঁর গ্রন্থে শরী'য়ত নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের ভাষায়। সুতরাং কোন 'আলেম যতই বিদ্যান বা বিজ্ঞ হোন না কেন কিতাব ও সুন্নাতের কোন একটি অথবা উভয়টির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তার অনুসরণ করা যাবে না। তবে যথাযথভাবে ইজতিহাদ করার পর যদি তার ইজতিহাদ ভুল হয় সে ভুলের জন্যও তিনি প্রতিদান পাবেন। তবে তাঁর ইজতিহাদে ভুল হলে ঐ বিষয়ে কারুর জন্য তার অনুসরণ করা জায়েয হবে না। প্রবন্ধের শুরুতেই এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বার বার একই কথা উল্লেখ করে সবাইকে জানান হলো।

فـــــائـــــــدة / ফলাফল

ইমাম ইয়াহইয়্যা যে যুক্তি দ্বারা (কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ, কবর উঁচুকরণ ও মাসজিদ নির্মাণ) প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাহলো:

মুসলিমদের এমন কিছু অভ্যাসগত 'আমল যাতে কেউই প্রতিবাদ করে নি।"

এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। অভিসম্পাত ঐ ব্যক্তির উপর যে এমন উক্তি করে কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো প্রতিটি যুগে মুসলিম 'আলেমগণ অব্যাহতভাবে বর্ণনা করে আসছেন। কবরে এসব অবৈধ কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র বিধানকে স্কুল-মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে আসছেন। সাহাবা যুগ হতে অদ্যাবধি, ছোট-বড়, ছাত্র-শিক্ষক প্রত্যেকেই তা নিরলসভাবে অব্যাহত রেখেছেন। হাদীছ বিশারদগণ

তাঁদের প্রধান ও বিখ্যাত (সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ) হাদীছ গ্রন্থসমূহে, মুসনাদ ও মুছান্নাফাতে ঐ বর্ণনাগুলোকে বিবৃত করেছেন। মুফাসসিরীনগণ তাঁদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে এগুলো উল্লেখ করেছেন। ফিকাহবিদরা বর্ণনা করেছেন তাদের ফিকহী কিতাবসমূহে। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ বিশেষভাবে তাঁদের ইতিহাস ও জীবনচরিত গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করেছেন।

তাহলে কিভাবে এ ধরনের অযৌক্তিক উক্তি করা যায়? *"মুসলিমগণ কবর পূজারীদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করে নি।"* অথচ তাঁরা ঐ কর্মকান্ডের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসগুলো রীতিমত বর্ণনা করে আসছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রত্যেক যুগের 'আলেমগণ কবরের উক্ত কর্মকান্ডে জড়িতদের উপর অভিশাপ ও ধিক্কার অব্যাহত রেখেছেন। সেই সাথে মুসলিম 'আলেমগণ নিরলসভাবে প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করে চলেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর উস্তাদ শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যাঃ (রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) (তিনি এ উম্মাতের আগে ও পরের সকলের জন্য এক গভীর ধী-সম্পন্ন ইমাম) থেকে ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেন: "জনসমাবেশে তিনি কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারপর বলেন: ইমাম আহমদ, শাফে'য়ী ও মালেক (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর মতবলম্বীগণও তা হারাম ঘোষণা করেছেন কিন্তু কেউ কেউ অবশ্য মাকরূহ বলেছেন। তবে তাঁদের প্রতি সুধারণাবশতঃ এই মাকরূহকে মাকরূহ তাহরীমী ভাবতে হবে। অভিশাপ ও নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র মুতাওয়াতীর হাদীছসমূহ থাকতে তাঁরা (বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফিকাহবিদ ও ইতিহাসবিদগণ) কবরপূজারীদের ঐসব কর্মকান্ডকে বৈধ মনে করেছেন এ ধারণাই করা যায় না।" (ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর উদ্ধৃতি এখানে শেষ।)

দেখুন! ব্যাপক জনগোষ্ঠির ঘোষণাকে তিনি কিভাবে বিবৃত করেছেন। এতেই প্রমাণ হয় যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বিতর্কের

অবশেষে 'উলামা ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। তারপর তিনি এর সমর্থনে মাযহাবত্রয়ের অবৈধতার যুক্ত ঘোষণাকে এনেছেন এবং একটি গ্রুপের মাকরূহ বিষয়ক ঘোষণাকে উল্লেখ করেছেন। আবার তা মাকরূহ তাহরীমী হিসেবে গ্রহণ করেছেন; তাহলে পাঠক সমাজ বলুন: কিভাবে (এ জঘন্য) উক্তি করা সম্ভব যে কবরের উপর গম্বুজ ও প্রতীক নির্মাণকে ঘিরে কেউ কোন প্রতিবাদ করেন নি।

তারপর ভেবে দেখুন! গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবর উঁচু করা ও গম্বুজ নির্মাণ বিষয়টি কঠোর নিষেধাজ্ঞার বিধান থেকে ব্যতিক্রম মনে করা কি করে সঠিক হয়? আমি আগেও উল্লেখ করছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"ওরা এমন এক জাতি যাদের মধ্যে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি বা বান্দার মৃত্যু হলে তার কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করত।"

তারপর এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কবরে গম্বুজ নির্মাণ বিষয়টি কঠোর ভাবে হারাম ঘোষিত হওয়ার পরও একজন মুসলিমের পক্ষে তাঁদেরকে ব্যতিক্রম মনে করা কিভাবে মেনে নেয়া যায়?

এমনিভাবে আহলে কিতাব যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশম্পাত করেছেন এবং যাদের কৃতকর্ম হতে মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তারা (আহলে কিতাবগণ) তো তাদের মধ্যে সৎ-ব্যক্তিদের কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করত। তারপর সৃষ্টির সেরা মানব, আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও সর্বশেষ রাসূল তাঁর কবরকে মাসজিদ, প্রতিমা, উৎসবস্থলে পরিণত না করার জন্য উম্মাতকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি উম্মতের জন্য আদর্শ। তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামে)'র আদর্শ, বাণী ও 'আমলে যারা অনুসরণ করে তারাই অধিকতর ভাগ্যবান; তারাই সর্বাধিক অগ্রগণ্য। উম্মাতের মধ্যে কিছু কীর্তিমান ব্যক্তির কবরের উপর এই ধরনের ঘৃণ্য

কাজের অনুমোদন হয় কিভাবে? সব কৃতিত্বের মূল ও প্রত্যাবর্তন স্থল তো একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কোন কৃতিত্বই তাঁর ন্যূনতম কৃতিত্বের তুলনায় গণ্য করার নয়। বিবেচনার কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কবরেই এটা (কবর উঁচু করা ও গম্বুজ নির্মাণ ইত্যাদি) নিষিদ্ধ ও অবৈধ হয়, আর যারা তা করবে তারাও যদি অভিশপ্ত হয় তাহলে তিনি ব্যতীত অন্যের কবরে এসব নির্মাণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি হওয়া উচিৎ? গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মর্যাদাকে লক্ষ্য করে অবৈধকে বৈধতাদান ও ঘৃণ্যকাজের বাস্তবায়ন কিভাবে সঠিক হয়। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করুন।

সর্বপ্রকার প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন আর তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের উপর এবং তাঁর সমস্ত বংশধরদের উপর।

من

تطهير الإعتقاد

للعلامة الشيخ

محمد بن إسماعيل الصنعاني

رحمه الله

'আকীদাঃ বিশুদ্ধীকরণ

বই থেকে সংকলিত

শায়খ মুহাম্মদ বিন ইসমা'য়ীল আস-সান'য়ানী (রহঃ)

'আকীদার বিশুদ্ধকরণের ব্যাপারে বিজ্ঞ 'আলেম শায়খ সান'য়ানী বলেন: "যদি আপনি প্রশ্ন করেন: কবরপূজার বিষয়টা তো বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রাচ্য, প্রতীচ্য, ইয়ামান, সিরিয়া, দক্ষিণ প্রান্ত ও এডেন নগরীসহ পৃথিবীর সব ভূখণ্ডেই পালিত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কবরের উপর গম্বুজ ও সৌধ নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। জীবিত ব্যক্তিরা মৃতদের ব্যাপারে শারী'য়ত বিরোধী 'আকীদা পোষণ করছে এবং তাদেরকে আলাদা মর্যাদা দিচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য তারা মানত করে; তাদের নামে শ্লোগান দেয়; তাদের নামে শপথ করে এবং এদের কবরও তাওয়াফ করে। আলোক সজ্জাপূর্বক কবরগুলোতে ফুলের মালা অর্পণ করে, খানা দেয়, উন্নত কাপড়ে আবৃত্ত করে। একাগ্রতা, বিনয়, নির্ভরতা, নিজেকে হেয় জ্ঞান করা ইত্যাদিসহ যত সব 'ইবাদতের শাখা আছে সবগুলোই তারা সে স্থানসমূহে করে থাকে। এই যে মুসলিমদের মসজিদগুলো এর কোনটির অভ্যন্তরে অথবা তৎসংলগ্ন কোথাও পাওয়া যাবে কবর অথবা তৎসংলগ্ন আড্ডাখানা। নামাযীগণ নামাযের সময়ে সেখানে জড়ো হয়ে উক্ত 'ইবাদত বা কিয়দাংশ আদায় করে। সুস্থ বিবেকে ধরে না যে এতবড় জঘন্যতম ঘৃণ্যকাজ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী চিন্তাবিদরা এ ব্যাপারে নিস্তেজ অথচ বিশ্বব্যাপী এঁদের রয়েছে পদচারণা।"

জবাবে বলছি: আপনি যদি ইনসাফ চান এবং পূর্বসূরীদের অনুসরণ পরিত্যাগ করেন আর এও জানালেন যে যার সপক্ষে দলীল রয়েছে তিনিই সত্য তাহলে বংশপরম্পরায় ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলিমদের মধ্যে যে অভ্যাস চলে আসছে তা সকলের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও সঠিক বা সত্য হতে পারে না। এ ব্যাপারগুলোর প্রতিবাদে যে গুণগুণানী শব্দ শুনতে পাচ্ছি এবং এর আস্তানাও গুঁড়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। এ গুণগুণানী এমন সব সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিম হতে নিসৃত যাদের কাছে ইসলাম বলতে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। পূর্বাপর মতবিরোধ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এরা অন্ধ অনুকরণ করে। এ

কার্যক্রম (কবরপূজা) প্রথমে এদের মধ্যে কোন একজন শুরু করে। তারপর গ্রামবাসীদের অন্তরে (মহব্বতের) দাগ কাটে। অধিবাসীরা শিশুদের মাধ্যমে কবরস্থিত ব্যক্তির নাম শ্লোগান আকারে প্রশিক্ষণ দেয়। শিশুরা বড়দেরকে মানত করতে দেখে, ভক্তি করতে দেখে। শিশুকে নিয়ে তারা কোন কবরের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয়। সেখানে তারা কবরের মাটি দিয়ে বাচ্চাদের শরীর মাখিয়ে দেয়। আর এ শিশুদেরকে কবরের চারিদিকে তাওয়াফ করায়। এভাবেই ছোটরা বেড়ে উঠে আর বড়রা হয় পৌঢ়। তারা এসবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনে না। যে ব্যক্তি দীনি 'ইলমের প্রতীক হয়ে ঘুরে বেড়ায়, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, বিচারে, ফতোয়া ও শিক্ষাদান করে, প্রশাসনে নেতৃত্ব দেয় এবং অভিজাতরূপে সকলের কাছে পরিচিত তারাই এ কাজের হোতা। তারাই আতিথেয়তা এবং মর্যাদা পাবার আশায় মানতের অর্থ আত্মসাত করে। কবরে উৎসর্গকৃত নযরসমূহ ভোগ করে। আর সাধারণ মানুষ ধারণা করতে থাকে এটাই বুঝি ইসলাম ধর্ম। ধর্মের মূল অগ্রভাগ বুঝি এটাই। ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি, কুরআন ও সুন্নাতের এবং সাহাবা চরিত্র বিদ্যায় দীপ্তমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে সংঘটিত অন্যায়ে কোন 'আলেম বা মুসলিমের নীরবতাই কিন্তু ঐ অন্যায়ের বৈধতার প্রমাণ বহন করে না।

পাঠকের কাছে এর আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। পকেট খরচ নামক চাঁদাবাজী, দীনী কাজের দোহাই দিয়ে (জোরপূর্বক) অর্থ আদায়- সর্বমত নির্বিশেষে হারাম। সারা দেশে একাজ এমন সহনীয় হয়ে গেছে যে এর ঘৃণ্যতা কারো কর্ণকুহরে প্রবেশই করে না। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভূখন্ড আদি গাঁ মক্কায়ও চাঁদাবাজদের হাত বিস্তৃত হয়েছিল। ইসলামের ফরদ (ফরজ) আদায়ের উদ্দেশ্যে (বিভিন্ন দেশ থেকে) আগত হাজীদের কাছ থেকেও তারা চাঁদা আদায় করে নিত। (বর্তমানে হাজী সাহেবানদের কাছ থেকে তা আদায় করা হয় না, ঐ প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে) তারা এই পবিত্র শহরেও এসব অবৈধ কর্মকান্ড ঢেলে

দিয়েছিল। অথচ এখানের জনগণ, জগতবরেণ্য 'আলেম ও শাসকগণও প্রতিবাদবিমুখ হয়ে নীরব ছিল। অন্যায় কাজ ও বিস্তার রোধে তাঁরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। 'আলেমদের বা মুসলিমদের এহেন নীরবতা কি এটা প্রমাণ করে যে ঐসব কাজ বৈধ বা সঠিক? সামান্যতম চেতনাবোধ যার আছে তিনি কি এমন কথা বলতে পারবেন?

আরো একটি উদাহরণ পেশ করছি: সর্বজনস্বীকৃত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান স্থান মাসজিদুল হারামে তৎকালীন সময়ে সিরিয়া, তুরস্ক ও জর্ডানের ভ্রান্ত শাসকরা মুসলিমদের সালাত আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক চারটি মুসাল্লা (নামাযের স্থান) তৈরি করেছিল। তখন কত যে গোলোযোগ আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল; আল্লাহ্ ছাড়া কারো জানা নেই। 'ইবাদতে যেমন ফাটল ধরিয়েছিল তেমন বিভক্ত করেছিল মুসলিমদেরকে শতাধিক দলে যা কেবল অভিশপ্ত ইবলিসেরই নয়ন জুড়িয়েছে আর মুসলিমদেরকে বানিয়েছে শয়তানের হাস্যস্পদে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ লোকেরা ছিল নিস্তব্ধ। পৃথিবীর দূরদূরান্তর থেকে 'উলামা ও সূফী সাধকগণ দলে দলে সেখানে উপস্থিত হয়ে সচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দু-চক্ষুধারী তা নিজ চক্ষে দেখেছে কেউ বাদ নেই। দু-কানধারী প্রত্যেকেই নিজ কানে শুনে গিয়েছে সে কথা।[১] (এখন বলুন) এ নীরবতা ও নিস্তব্ধতা কি ঐ কর্মকান্ড বৈধতার দলীল?

সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো তা স্বীকার করে নিবে না। কবরপূজারীদের জারীকৃত উক্ত কর্মকান্ডে 'আলেমদের নীরবতাও ছিল প্রায় একই পর্যায়ের।

---

১. বাদশা 'আবদুল 'আযীয মাক্কায় প্রবেশের আগে হারাম শারীফে চারটি মুসাল্লা অর্থাৎ নামাযের জায়গা ছিল। প্রত্যেক মাযহাবের লোক নির্দিষ্ট মুসাল্লায় আপন ইমামের পিছনে নামায আদায় করত। বাদশা 'আবদুল 'আযীয এ মুসাল্লাগুলো ভেঙ্গে দিয়ে সব মুসলিমকে নিয়ে এক ইমামের পিছনে নামায আদায় করার। এ ঘটনা ঘটে ১৩৪৩ হিজরী সালে। পরে মাতাফ (তাওয়াফের স্থান) বিস্তৃত করে সব মুসাল্লার মূল উৎপাটন করা হয়েছিল। এসবের আর কোন চিহ্নই বাকী নেই।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন: উক্ত বক্তব্য থেকে এ ধারণা জন্ম নিতে পারে যে এ উম্মাঃ একটি ভ্রান্ত নীতির উপর ঐক্য বা ইজমাঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে কেননা তারা এ চরম ভ্রষ্টতার প্রতিবাদ না করে নীরব ছিলেন। (যেহেতু কোন কাজের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাঃ প্রতিবাদ না করে নীরব থাকার নামই হলো ইজমাঃ)
জবাবে বলছি: প্রকৃতপক্ষে ইজমাঃ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র যুগের পর কোন বিষয়ে উম্মাতে মুহাম্মদীর মুজতাহীদগণ একমত হওয়া।
ইমাম চতুষ্টয়ের মৃত্যুর পর চার মাযহাবের ফকীহগণ ইজমাকে অসম্ভবই মনে করেন। এ কথাটি একেবারেই পরিত্যাজ্য। মূলকথা হলো স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই এ ধরনের কথা বলতে পারে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস চার ইমামের ইন্তেকালে পর আর কখনো ঐক্য অনুষ্ঠিত হবে না। তাদের এ ধারণা ধোপে টিকে না। মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের যুগে এ নব্য কুসংস্কার, বিদয়াঃ ও কবরকেন্দ্রিক ফিতনা ও গোলযোগ ছিল না। আমাদের তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক বিবেচনায় আজকের দিনে ইজমাঃ অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব কারণ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে উম্মাতে মুহাম্মদীতে পরিপূর্ণ। প্রতিটি ভূখন্ডে ও দেশে এদের বসবাস ও বিস্তৃতি। যার কারণে মুহাক্কিকীন 'ওলামাদের সংখ্যা নিরূপণ অনিশ্চিত। সকলের জীবনচরিত সম্পর্কে কেউ অবহিত হতে পারছে না। ধর্মের প্রসারতা ও মুসলিম 'উলামার সংখ্যাধিক্যের পর ইজমার দাবী করা অসম্ভব। বিজ্ঞ ইমামগণেরও এই মতামত। তারপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে 'আলেমগণ অন্যায়-অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ না করে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন তারপরও তাদের এ নীরবতা কিন্তু অন্যায়কে বৈধ প্রমাণ করে না; কেননা তাঁরা শরী'য়তের বিধান সম্পর্কে অবহিত। তারা অবগত আছেন যে, অন্যায়ের প্রতিবাদের তিনটি পর্যায় রয়েছে।
১. কঠোর হস্তে দমন। অন্যায়ের মূলোৎপাটন ও দূরীকরণ।
২. দৈহিক ক্ষমতায় অক্ষম হলে কথার দ্বারা প্রতিবাদ।
৩. দৈহিক শক্তির অক্ষমতায় আন্তরিক প্রতিবাদ (ঘৃণা) করা।

এ তিনটি বিষয়ের কোন একটিতে অক্ষম হলে অন্যটির দায়বদ্ধতা বিলুপ্ত হয়ে যায় না।

উদাহরণস্বরূপঃ কোন 'আলেম ব্যক্তি যখন মজলুমদের সম্পদ লুণ্ঠনকারী কোন ছিনতাইকারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তিনি হাতে বা মুখে কোনভাবেই ঐ ছিনতাইকারীর প্রতিবাদে সক্ষম নন কেননা তিনি পাপীষ্ঠদের দ্বারা লাঞ্ছিত বা অপদস্থ হতে পারেন। প্রতিবাদের দুটি পর্যায়ের শেষ হল। অবশিষ্ট রইল আন্তরিক প্রতিবাদ অর্থাৎ ঘৃণা করা যা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

তাহলো যে ব্যক্তি কোন 'আলেমকে দেখে যে তিনি দুস্কর্ম ও জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্বেও চুপ রয়েছেন; তার প্রতি এই প্রত্যক্ষকারীর বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে তিনি হাতে ও মুখে প্রতিবাদ করতে অক্ষম ছিলেন; কিন্তু তিনি অন্তরে ঘৃণ্যবোধের মাধ্যমে উক্ত দুষ্কর্মের প্রতিবাদ অবশ্যই করেছেন কেননা ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাপারে সুধারণা ও তাদের পক্ষে যথাসম্ভব সুব্যাখ্যা প্রদান করা (সাধারণ মুসলিমদের) নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

হারাম শারীফে যে শয়তানী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল যা ধর্মীয় ঐক্যে ফাটলসহ মুসলিমদের সালাত/নামাযকে ভাগ করে দিয়েছিল। হারামে যাতায়তকারী তৎকালীন 'উলমা সম্প্রদায় ও প্রত্যক্ষদর্শীগণ কঠিন হস্তে দমন ও বলিষ্ঠ বক্তব্য দ্বারা প্রতিবাদ করতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম ছিলেন। অন্তরে জমাকৃত ঘৃণ্য প্রতিবাদ ছাড়া তাদের আর কোন গতি ছিল না যেমনটি হয়ে থাকে কবরপূজারী, দুস্কৃতকারী ও ছিনতাইকারীদের কাছ দিয়ে অতিক্রমকারীদের সময়।

এ থেকে ইজমাঃ সংক্রান্ত মূল সমস্যাটি জানা হলো। ইমামদের অনেকেই ইজমার দলীল হিসেবে এ উক্তি পেশ করেন:

" أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعًا "

"অর্থাৎ কোন বিষয় সংঘটিত হয়েছে কেউ এর প্রতিবাদ করেন নি; অতএব ইজমাঃ হয়ে গেছে।" এ উক্তি সঠিক নি।

সমস্যার মূল কারণ: তাদের উক্তি অনুমান নির্ভর (ولم ينكر) অর্থাৎ "কেউ প্রতিবাদ করে নি"

কেননা এমন অনেকে আছেন যারা বাহু ও বাক শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হওয়ায় শুধুমাত্র আন্তরিক ঘৃণাবোধের মাধ্যমে অন্যায়ের

প্রতিবাদ করেন। আপনি নিজেই তো এ আধুনিক যুগে দেখতে পাচ্ছেন কত যে অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে যার প্রতিবাদ আপনি করছেন না; না হাতে না মুখে অথচ আপনি অন্তরে ঠিকই ঘৃণা করে যাচ্ছেন। কোন নির্বোধ ব্যক্তি আপনাকে তা প্রত্যক্ষ করতে দেখলে বলে উঠবে: অমুক ব্যক্তি তো প্রতিবাদ করে নি। এ ধরনের মন্তব্য হয়তো তিরস্কারের ভাষায় হবে নচেৎ আপনার নীরবতায় সমবেদনা জ্ঞাপন হবে। অতএব এ নীরবতাকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করবে না। এমনিভাবে তারা দলীল উপস্থাপনের সময় আরেকটি ত্রুটিপূর্ণ উক্তি ব্যবহার করে থাকে: "অমুক ব্যক্তি কাজটি করেছেন, অন্যরা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন সুতরাং ইজমাঃ বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

দু'টি কারণে এ কথাটি ত্রুটিপূর্ণ : (১) কোন বিষয়ের নীরবতাকে ঐ বিষয়ের অনুমোদনের দাবী করা; কেননা শুধু নীরবতাই কোন কাজ অনুমোদনের প্রমাণ নয়।

(২) তাদের মন্তব্য ([illegible]) *"ইজমাঃ বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে"* এ মন্তব্যটি ঠিক নয় কারণ ইজমাঃ বলতে উম্মাতে মুহাম্মদীর শুধুমাত্র মুজতাহিদীনের মতৈক্যকেই বুঝায়। সুস্পষ্ট বক্তব্য ব্যাতিরেকে নীরবতাকে কোন অবস্থাতেই ঐক্য বলা যাবে না এবং ঐক্যের বিপক্ষও বলা যাবে না।

জনৈক বাদশার রাজদরবারে উপস্থিত সভাসদরা কোন এক কর্মচারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমতাবস্থায় বাদশা একজনকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি হল? তুমি যে এদের মতো কিছু বলছ না? লোকটি উত্তর দিল: যদি মুখ খুলতাম তো এদের বিরুদ্ধেই বলতাম। তাহলে বুঝতে হবে সব নীরবতাই সম্মতি নয়।

এ সমস্ত অপকর্মগুলোর জন্ম তারাই দিয়েছে যাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। যাদের জান-মাল ও ইজ্জত অত্যাচারী শাসকদের আদেশ ও কলমের অধিনস্থ; তারা কিভাবে গড়ে তুলবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ?

কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ, বিভিন্ন প্রতীক যা শিরক ও কুফরীর প্রতি ধাবিত হওয়ার বিরাট এক মাধ্যম; ইসলামকে ধ্বংস এবং এর

ভীত নড়বড়ে করে দেয়ার একটি বড় ধরনের উপায়। এগুলোর নির্মাতা অধিকাংশই রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রশাসক। হয়ত এদেরই নিকটাত্মীয় অথবা গুণী, 'আলেম, সূফী, সাধক, ধর্মগুরু বা ধর্মীয় নেতা হিসেবে যাদের প্রতি সুধারণা রয়েছে তাদের স্মরণে এসব নির্মাণ করেছে। সাধারণ কবর যিয়ারতকারীরা এর যিয়ারত করে থাকে। তাদেরকে কোন মাধ্যম মনে করে না। তাদের নামে কোন শ্লোগানও দেয় না বরং সাধারণ যিয়ারতকারীরা এসব কবরবাসীর জন্য দু'য়া করে। তাদের জন্য গুনাহ মাফ চায়। কালক্রমে দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নেয়। এদের পরে যারা আসে তারা দেখতে পায় কবর তার উপর জ্বলছে মোমবাতি, বিছানো রয়েছে বিলাসবহুল গালিচা, জড়িয়ে আছে আভিজাত্যের পর্দা, ছড়ানো ছিটানো গোলাপগুচ্ছ ও পুষ্পরাজি। এসব দেখে তাদের (সাধারণ মানুষের) অন্তরে বিশ্বাস জন্মাতে থাকে। সম্ভাব্য কল্যাণ অথবা দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য এসবের আয়োজন। অবস্থা বুঝে কবর রক্ষণাবেক্ষণকারীরা এসে মৃত ব্যক্তির নামে উদ্ভট বানোয়াট ও মিথ্যা বয়ান দিতে থাকে যে তিনি এটা করেছেন, ওটা করেছেন, অমুকের উপর মুসিবত দিয়েছেন এবং অমুকের কল্যাণ করেছেন। ধীরে ধীরে এসব যাবতীয় মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প (কবর যিয়ারতে) আগতদের অন্তরে গেঁথে যায়। এ জন্যই দেখা যায় যারা কবরের উপর আলোকসজ্জা করে, মোমবাতি জ্বালায়, কবর পাকা করে এবং এর উপর লেখে তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম)'র হাদীছসমূহে কঠোরভাবে অভিশাপ বাণী বর্ণিত আছে। এ সম্বন্ধে বহু সহীহ হাদীছ রয়েছে। কবরকে কেন্দ্র করে এসব কর্মকান্ড এমনিতেই নিষিদ্ধ তদুপরি এর দ্বারা বিরাট গোলযোগ ও বিশৃংখলা হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়: এই যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কবরটি যার উপর বহু অর্থ ব্যয়ে বিশাল গম্বুজ নির্মিত হয়েছে এটা কি জায়েয?

উত্তরে বলবো: এ প্রশ্ন বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে এক বড় ধরনের অজ্ঞতা হতে সৃষ্ট; কেননা এ গম্বুজ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা স্বীকৃত নয়। সাহাবাগণ (রাঃ) তৈরি

করেন নি। তাবে'য়ীন অথবা তাবে' তাবে'য়ীন থেকেও চালু হয় নি। মুসলিম মিল্লাতের 'আলেমগণ, ইমামগণ কেউ চালু করেন নি। "তাহ্কীকুন্নাসরাঃ বি-তাল্খীস মু'আলামি দারুল হিজরাঃ" (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কবরের উপর নির্মিত এই বিশাল গম্বুজটি পরবর্তী যুগের ৬৭৮ হিজরীতে আল-মালিক আল-মানসূর কালাউন আস-সালেহী নামে কোন সম্রাট কর্তৃক নির্মিত। এটা ব্যক্তির ব্যাপার; শার'য়ী দলীল নয় যে উত্তরসূরীরা বা পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে চলতে হবে। শেষের এ কথাটিই ছিল আমার আলোচিত বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে বালা-মুসীবত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, বেড়ে চলেছে প্রবৃত্তির অনুসরণ। 'উলামা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনীহা প্রকাশ করছে, অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাদের দায়িত্ব। সাধারণ মুসলিম যেদিকে ধাবিত তারাও সেদিকে ঝুঁকে পড়েছেন ফলতঃ মন্দ হয়ে গেছে ভাল আর ভাল হয়ে গেছে মন্দ। নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি এসব গর্হিত কাজ থেকে বাধা দিতে দেখা যায় না। মনে হয় কোন প্রতিবাদকারী নেই।

যদি প্রশ্ন করেন: মাজযূব বা পাগলা নামে পরিচিত কিছু লোক কখনো কখনো জীবিত ব্যক্তিদের সাথে অথবা মৃত ব্যক্তিদের সাথে (তথাকথিত মুরাকাবা, ধ্যান ও সাধনার মাধ্যমে) এমনভাবে নিজেদেরকে সম্মিলন ঘটায় যার ফলে তারা আশ্চর্যজনক বা অলৌকিক কিছু কর্মকান্ড দেখাতে সক্ষম হয় এবং তাদের এসব কর্মকান্ড মানুষের মনের উপর ভীষণ প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তরে বলব: যারা মাজযূব বা পাগলা নাম ধারণ করে 'আল্লাহ' শব্দটিকে মুখের ভেতর বিভিন্ন আওয়াজ যুক্ত করে উচ্চারণ করে; সে সমস্ত আওয়াজ 'আরবী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরূপ আওয়াজকারীরা অভিশপ্ত ইবলিস বাহিনীসমূহের একটি বাহিনী এবং রংঢংয়ের দুনিয়ার মোহে আসক্ত কেননা আল্লাহ'র এই নামের

সাথে কোন গুণবাচক শব্দ যুক্ত না করে শুধু একক ভাবে আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্ উচ্চারণ করলে কোন যিক্‌র হয় না, তাওহীদও হয় না। বরং এটা যেন মহাসম্মানিত শব্দকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর 'আরবীভাষা থেকে খারিজ করে দেয়ার শামিল। যদি একজন সৎ বা মহান ব্যক্তির নাম যায়েদ হয় আর কিছু লোক যদি একত্রে সমস্বরে যায়েদ, যায়েদ, যায়েদ বলে উচ্চারণ করতে থাকে তবে তা অবশ্যই অর্থহীন; ফলে তা যায়েদের প্রতি উপহাস, অপমান ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ বলেই গণ্য হবে। বিশেষতঃ যখন ঐ উচ্চারণের সাথে বিকৃত কোন আওয়াজ যুক্ত করা হয়। তারপর দেখুন তো কুরআন ও হাদীছের কোথাও কি (আল্লাহ তা'য়ালার এ যাত নামের সাথে কোন গুণবাচক শব্দ যুক্ত না করে) শুধু 'আল্লাহ্' শব্দে উল্লেখ আছে; অথবা কোন স্থানে কি এই শব্দটি পরপর একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে? তাওহীদ, তাসবীহ, তাহলীল (অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ) ইত্যাদিই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নিয়মিত যিক্‌র ও দু'য়া। এগুলোই হলো তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের কৃত যিক্‌র। তাঁদের যিকিরে ছিল না এমন কোন চিৎকার, অস্বাভাবিক আওয়াজ বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কোন কসরৎ যা তথাকথিত যিকিরকারীদের যিকিরে প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। উক্ত যিকিরকারীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছে। তারপর তারা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে যোগ করেছে মৃতদের নাম। উদাহরণ স্বরূপঃ ইব্‌নে আলাওয়ান, আহমদ বিন হুসাইন, আব্দুল কাদীর ও আল আদরূস প্রমূখ। অবশেষে এরা যুলুম এবং অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় 'আলী রুমান ও 'আলী আহমার প্রমূখ কবরবাসীর দিকে ধাবিত হয়। ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বর্বরদের মুখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর রাসূল এবং সাহাবা ও দীনদার ব্যক্তিদের নাম বিকৃতি থেকে রক্ষা করুন নতুবা এরা (এসব পবিত্র নামগুলোর সাথে) বিভিন্ন প্রকারের কুফর, শিরক ও অজ্ঞতার সংমিশ্রণ করে দিবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ যারা 'আল্লাহ্' শব্দটিকে মুখের ভিতর থেকে বিকৃত আওয়াজে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করে এবং লম্পট ও বেকার শ্রেণীর লোকদেরকে তাদের দলে ভিড়ায়। অতঃপর এদের

দ্বারা বিভিন্ন কৌশলে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করে "কারামাত" বলে প্রচার করে যেমন ধারালো যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে, সাপ বিচ্ছু, কাকড়া সাথে বহন করে চলতে পারে, মুখে আগুন ঢুকিয়ে দেয়, আগুনের মধ্যে হাত রাখে, সম্পূর্ণ শরীরটা নিয়ে অগ্নির ভিতর উলোটপালট খায় ইত্যাদি - এদের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

জবাবঃ এরা সব শয়তানের অনুসারী বা শয়তানী কর্মকান্ডের সহযোগী। আপনিও যদি এগুলোকে মৃত ব্যক্তিদের কারামত অথবা জীবিত ব্যক্তিদের পুণ্যের প্রভাব বলে বিশ্বাস করেন তবে শয়তান আপনার উপরও ভর করেছে কেননা এটা পথভ্রষ্ট শয়তান-ই আল্লাহর সৃষ্টি ও পরিচালনার ব্যাপারে (মিথ্যা) অংশীদার ও প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করিয়েছিল। এই যে মৃত ব্যক্তিগণ যাদেরকে আপনি আল্লাহর ওলী মনে করছেন? আচ্ছা বলুন তো! আল্লাহর ওলীরা কি মাজযূব বা পাগলা হয়? অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে অংশীদার বা প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করাতে পারে? আপনি যদি তা-ই ধারণা করেন তাহলে আপনিও মস্তবড় অপরাধ করেছেন। মৃতব্যক্তি সংক্রান্ত এসব কর্মকান্ড তাদেরকে মুশরিকে পরিণত করে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দিয়েছে। তা এজন্য যে তারা প্রফুল্লচিত্তে সন্তুষ্ট হয়ে ঐসব কবরবাসীদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করিয়েছে। আর কিভাবে বিশ্বাস করলেন এসব কর্মকান্ড পাগল ও ভন্ড মুশরিকদের কারামত। এরা সব ভ্রান্ত 'আকীদার অনুসারী। এরা এতই নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক যে মহান আল্লাহকে একটা সেজদাও করে না। আল্লাহকেও স্মরণ করে না। আপনি যদি তাদের এ কর্মকান্ড মেনে নেন তাহলে পাগল কাফির ও মুশরিকদের জন্য কারামত প্রমাণ হয়ে যাবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ইসলামী বিধান ও সুস্পষ্ট দীনের মূলনীতি। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে সুসংহত শরী'য়ত।

আপনি যখন এই বিষয়দ্বয়ের অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এ সবই শয়তানী ও আল্লাহদ্রোহী কর্মকান্ড এবং ইবলিসী আচরণ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী

অনুসারীদেরকে বিপথগামী করার লক্ষ্যে শয়তান এই গ্রুপটির সাহায্যার্থে তার চেলা চামুন্ডারা এ কর্মগুলো করে থাকে।
হাদীছ শারীফে বর্ণীত :
"শয়তান ও জ্বীনেরা সর্প ও অজগরের আকৃতি ধারণ করে।"
এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। অতএব সাধারণ মানুষ যা প্রত্যক্ষ করছে মাজযূব বা পাগলাদের হাতে তা হচ্ছে ঐ অজগরদের (শয়তান ও জীন)'র কারসাজী। আবার কখনো কখনো যাদুর মাধ্যমেও তাদের কারামত প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের যাদু আছে। তা শিক্ষা করা খুব একটা কঠিন নয় তবে তার প্রবেশদ্বার অত্যন্ত ভয়াবহ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কুফরী করা ও আল্লাহ তা'য়ালা যা মহিমান্বিত করেছেন তা অস্বীকার করা অর্থাৎ সংরক্ষিত কুরআন হাদীছকে তুচ্ছ জ্ঞান ও অবমাননা ইত্যাদি করলে সহজে যাদু শেখা যায়। ফলে মাজযূব উন্মাদদের কীর্তি যতই অলৌকিক হোক তা কখনো কারামত হতে পারে না। তাদের এসব কর্মকান্ড থেকে সবসময় সাবধান থাকতে হবে যেন কারামতের নামে সাধারণ মানুষ ধোকা না খায়। যাদু বা যাদুগিরীর যথেষ্ট কার্যকরী প্রভাব রয়েছে। যাদুকরেরা ভেলকিবাজির মাধ্যমে দৃশ্যমান কোন বস্তুকে ভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তর করতে পারে। ফির'আউনের যাদুকররাও বড় বড় অজগর সাপ ও বিচ্ছু দিয়ে পুরো উপত্যকাই ভরাট করে ফেলেছিল। এ সব দেখে মূসা 'আলাইহিস সালাম তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন।
এ সমস্ত শয়তানী ক্রিয়াকান্ড ও ব্যাপারগুলো সুনির্দিষ্ট তা বুঝার জন্য অনাগত দাজ্জাল কর্তৃক কর্মকান্ডগুলোই যথেষ্ট। আসলে আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সুন্নাতের বিরুদ্ধাচারণই হচ্ছে এসমস্ত অবৈধ কর্মকান্ডগুলো বুঝার মূল চাবিকাঠি।
আমার উপস্থাপিত বিষয় এখানেই শেষ। আদি-অন্তে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবাদের উপর। যাকিরীনগণ সবসময় তাঁকে স্বরণ করেন। আর গাফেলগণ তাঁর স্মরণ থেকে বিস্মৃত থাকে ।

من

فتوى علامة الهند

صديق حسن القنوجي

رحمه الله

'আল্লামা শায়খ সিদ্দীক হাসান কনৌজী (রাহমাতুল্লাহ 'আলাইহি)'র

ফাতওয়া

থেকে সংকলিত

শায়খ সিদ্দীক হাসান কনৌজী বলেনঃ

প্রতি যুগে প্রতি স্থানে 'আলেমগণ মানুষকে খাঁটি তাওহীদের নির্দেশনা দিয়ে আসছেন এবং শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরবিচ্ছন্নভাবে মানুষকে নিষেধ করে আসছেন। সত্যবাদী নাবীর বাণী অনুযায়ী : শিরক পিপিলিকার মন্থর গতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও অশ্রুত। অনেক শিক্ষিত সমাজের নিকট এ তথ্য অত্যন্ত সুপ্ত বা অজানা হয়ে আছে। এ উদাসীনতা ও অজ্ঞতার কারণেই শিরক জাতীয় কিছু কর্মকাণ্ডে তারা ডুবে আছেন। 'আলেমদের বিশাল বিশাল গ্রন্থে ও অনেক কবিদের কাব্যগাঁথায় এ ধরনের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে বিশেষতঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং রাজা-বাদশাহদের গুণগানে রচিত কবিতায় এসব লক্ষণীয়। এমনকি এই জ্ঞানপাপীর দল কখনো কখনো এমন কথা রচনা করে যা শুনলেই গা শিউরে উঠে; থরথর করে কেঁপে উঠে অন্তরাত্মা। আশঙ্কা হয় এখুনি বুঝি আবৃতিকারীর উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।

তাদের উদাসীনতা, অজ্ঞতা ও অলসতাই এর একমাত্র কারণ নয় বরং পারিপার্শিকতা ও পঠিত কাব্যগাঁথাও এসবের দ্বার খুলে দেয়। শিরকের কারণগুলোর মধ্যে- সুদৃঢ় ও উঁচু কবর তৈরি করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, মূল্যবান কাপড়ে পর্দাবৃত্ত করা এবং মোমবাতি জ্বালানো, সেখানে সমবেত হয়ে বিনয় ও নতিস্বীকার করা এবং মৃতদের নিকট আবেদন পেশ করা এবং খাঁটি অন্তরে কায়মনোবাক্যে তাদের নিকট দু'আ করা ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই ধরনের ক্রিয়াকান্ডগুলো যখন বংশ পরম্পরায় একজন থেকে অন্যজনের নিকট চলে আসে; আর পরবর্তীরা তা অনুসরণ করে চলে পুর্বসূরীদের আর তখনই ব্যাপারটি বিপদজনকহারে বেড়ে যায়। বৃদ্ধি পায় তার কুপ্রভাব; বিপদাশঙ্কা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে। ফলতঃ বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলে, শহরে বা গ্রামে এবং প্রতিটি সমাজে ঐ মৃতদের ব্যাপারে অনুরূপ চিত্র দেখা যায়।

জীবিতদের একদল মৃতদের ব্যাপারে অকল্পনীয় এক ধারণা পোষণ করে আসছে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কবরের পার্শ্বে অবস্থান নিয়ে নিজেদেরকে মৃতদের সাথে সংযুক্ত করে। শিরকে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের বিবেচনায় এ কর্মগুলো সঠিক ও সুন্দর এবং মনের মাঝে আনন্দস্বরূপ হয়ে উঠে।

এমনকি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর পরিণত বয়সে পৌছুনো পর্যন্ত কবরপূজারীদের ডাকাডাকি ছাড়া কিছুই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। কবর যিয়ারত তো অব্যাহত আছেই। শিশু আরও দেখতে পায় কেউ মৃত ব্যক্তিকে ডাকছে, কেউ অসুস্থ হলে আরোগ্যলাভের জন্য তার পরিবার অর্থ ব্যয় করেছে, বিপদের মুহূর্তে কবরবাসীকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করছে, মনোবাসনা পূরণের জন্য কবরের পার্শ্বে অবস্থানকারী ও সমাধিস্থদের খাদেমদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করছে। আর এর ফলে বিভিন্ন কৌশলে সাধারণ মানুষের অর্থ লুটপাট হচ্ছে।

পরবর্তী পর্যায়ে শিশু বড় হলে শৈশবে দেখা ও শুনা এসব ব্যাপারই তার মানসপটে ভেসে উঠে কেনন৷ শিশুর কোমল হৃদয়ে কৈশরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। তাইতো সর্বসত্যবাদী মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"প্রত্যেক নবজাত শিশুই তার স্বভাবজাত প্রকৃতি (ইসলাম) নিয়েই ভূমিষ্ট হয়। তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের এ সত্য বাণীর গুরুত্ব, বিশেষত্ব ও বাস্তবতা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত।

সর্বপ্রথম শিশুকে যে লালনপালন করে শিশু তারই স্বভাবচরিত্র গ্রহণ করে। আর সর্বপ্রথম শিশু যাদের চরিত্রে আকর্ষিত হয় তারা হলেন পিতা-মাতা। তারা সৎ হলে সন্তানও সৎ হবে আর তারা অসৎ হলে সন্তানও অসৎ হবে।

শিশুরা যখন শৈশবকাল পেরিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় চলতে শুরু করে তখন তারা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার দ্বারা প্রভাবিত

ধ্যানধারণায় দেখতে পায়। এমনও দেখা যায় যে শিশুর জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম সে যেসব স্থানের সাথে পরিচিত হয় এবং ঘন ঘন যাতায়াত করে তার মধ্যে অধিকাংশই হলো প্রসিদ্ধ মাযার ও কবর যেখানে বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য মানুষ উপস্থিত হয়। শিশু গভীরভাবে যা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তা হলো কবরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হৈ-হুল্লোড়, আর্তনাদ-ফরিয়াদ, সম্বোধন, ডাকাডাকি ইত্যাদি। সে আরো দেখতে পায় তার বাপ-মা এবং অন্য বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তিরাই এসব কাজে লিপ্ত। এ সব দেখে তাদের পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত ধারণা আরও জোরদার হয়। বিশেষতঃ যখন দেখতে পায়, কবরগুলো বিলাসবহুল ভবনে নির্মিত, চারদেয়াল নানা রঙ্গে সজ্জিত, দামী কাপড়ের পর্দাবৃত, সুগন্ধি, চন্দন, আতর ও গোলাপের মনমাতানো সৌরভ। কবরের চতুর্দিক আলোকজ্জ্বল ঝাড়বাতি ও মোমবাতি। আর রক্ষণাবেক্ষণকারী তো তারাই-যারা সেখানে অবস্থান করে। তারাই সাধারণ সরল মানুষদের অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য বিভিন্ন ছলচাতুরীসহ বিবিধ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। শিশু দেখতে পায় তারা কবরকে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এগুলোর ব্যাপারে মানুষের মনে ভয় ও ভক্তি উদ্রেক করে, যিয়ারতকারী আগত প্রতিনিধিদলকে হাতে ধরে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গি ও ভক্তিতে কবরস্থানে নিয়ে যায়। নিকৃষ্টতম কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এতে কবর ও কবরস্থিত ব্যক্তির প্রতি ঐ বেচারার ভক্তি বিশ্বাস বেড়ে যায়। মৃত ব্যক্তির মহত্ত্ব ও মর্যাদা ধারণা করতেই তার বিবেক নত হয় আর তখনই তার অন্তরে ভ্রান্ত 'আকীদা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, দয়া ও তাওফীক ছাড়া তা অন্তর থেকে দূরীকরণ কোন ক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠে না।

এভাবে বাড়ন্ত শিশু বিদ্যার্জনকালে অধিকাংশ 'আলেম ও শিক্ষককে ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও সুধারণায় দেখতে পায়। সরলমনা এই কচি-শিশুরা আরও দেখে যে এরা কবরবাসীকে খুবই মর্যাদা দিচ্ছে। তার ভালবাসাকে আল্লাহ্‌র নিকট মহান পুঁজি

হিসেবে গণ্য করে। এ ভ্রান্ত বিষয়ে যারা এদের বিরোধিতা করে তাদেরকে এ বলে অপবাদ দেয় যে ঐ ব্যক্তি ওলীদেরকে বিশ্বাস করে না; সৎ লোকদেরকে ভালবাসে না; তাদের কারামতে বিশ্বাস করে না ইত্যাদি যাবতীয় মিথ্যাপবাদে সত্যানুসারীদেরকে জর্জরিত করে ফেলে। এমনকি বিরুদ্ধবাদীদেরকে বংশ ধরেও গালিগালাজ করে ফলে ঐ মৃত ব্যক্তিদের প্রতি এই নব্য বিদ্যার্থীদের ভালবাসা আরও গভীর হয়; ভক্তি-বিশ্বাস হয় আরো পাকাপোক্ত হয়।

আর যদি ধরে নেই যে তাদেরই কোন একজন আলেমকে আল্লাহ তা'য়ালা সঠিক অনুপ্রেরণা দান করেছেন যিনি শারী'য়তের সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্য পথের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে উঁচু কবর নির্মাণ এবং তা পাকা করা নিষিদ্ধ। এমনিভাবে কবরে উপরে কিছু লেখা, আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো, ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাজানো নিষেধ। উঁচু কবরগুলোকে মাটির সমান করার নির্দেশ সম্পর্কে তিনি অবহিত। আরও অবগত আছেন কবরকে মসজিদ বা সিজদার স্থান হিসেবে গ্রহণ না করার হুকুম সম্পর্কে। তিনি জানেন (সাধারণ মানুষ) কবরবাসীদের নিকট দু'য়া করে এক ধরনের 'ইবাদত হিসেবে। আর 'ইবাদত তো একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। সুখে-দুঃখে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'য়া করা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, মঙ্গল-অমঙ্গলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ সবই চরমভাবে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে আম্বীয়া 'আলাইহিস সালাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা ও পরবর্তীতে আগত মুসলিম মিল্লাতের মাঝে কোন তফাৎ নেই। সচরাচর তাদের মাঝে এমন ব্যতিক্রমধর্মী 'আলেম হয় না।

বহু 'আলেম আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ আদেশসমূহ মানুষকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে যান। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা নীরব ভূমিকা পালন করেন। এই নীরবতার কারণ হতে পারে আল্লাহর আদেশ পালনে শৈথিল্য, শান্তিতে বাস করা, আয়েশী ও সহনশীলতায় অনুরাগী এবং মানুষের মাঝে

আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার অভিপ্রায় কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তাঁর অর্জিত বিদ্যা তারই জন্য বিপদ, ঘৃণা ও অভিশাপে পর্যবসিত হয়। এ ব্যক্তির দুনিয়াতে বেঁচে থাকা না থাকা উভয়ই সমান বরং থাকাটাই বেশী ক্ষতিকর কেননা তিনি কবরভক্তদের প্রবেশদ্বারে পা দিয়েছেন তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস 'আলেম ব্যক্তিটি তাদেরই পক্ষের একজন। এ পর্যায়ে তিনি তাদের নিকট সাক্ষী বা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হন। এসব কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে উক্ত 'আলেমদের ভূমিকা কখনো অনুকূল হয় না। সাধারণ মানুষ তাঁর ভূমিকাকে কবরভক্তদের অনুমোদন ও স্বীকৃতির সনদ হিসেবে উপস্থাপন করে। 'আলেমদের মধ্যে সত্য প্রচার ও ব্যাখ্যা প্রদানে দায়িত্ব পালনের লোক নিতান্তই অভাব। এ জন্যই আল্লাহ পাক তাদের 'ইলমের বরকত তুলে নিয়ে এমনভাবে তা মিটিয়ে দেন যে এরপর তারা আর সফল হতে পারে না।

ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন: "সত্যবাণী প্রচারের উদ্যোক্তা ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিবৃতি প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন লোক বড় বড় শহরেও খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু বিশাল ভূখন্ডে দু-একজন (তাওহীদপন্থী 'আলেম) পাওয়া যায়। বিশাল জনগণের প্রয়োজনে তারা তুচ্ছ ও পরাভূত! ফলে তাওহীদ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত লোকদের আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের লক্ষ্যে তাওহীদপন্থী 'আলেমদের প্রচেষ্টায় কখনো কিছুটা প্রভাব ফেলে, আবার কখনো মোটেও প্রভাব ফেলে না।

আর কিছু সংখ্যক 'আলেমদের ভূমিকা সমাজের নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাদের রচিত গ্রন্থাবলী ও কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুতে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের মতানুযায়ী ভাল-মন্দ যা-ই বুঝেছেন তা সমাজের নিকট উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানে তাদের সাথে কথা বলা ও উপদেশ প্রদানের কোন সুযোগ নেই; কিন্তু তারা যে কর্মকান্ড করে গিয়েছেন এবং তাঁদের গ্রন্থে ও কাব্যে যে বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে তা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা আমাদের

প্রক্তি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জগতবাসীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া অপরিহার্য যে অমুক লেখক বা কবি তার গ্রন্থে বা কাব্যে যা বলেছেন তা ইসলামীবিরোধী এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর আরোপিত বিধি-বিধান পরিপন্থী। যারা এসব 'আমল করবে তারা কুফর ও শিরকের কোন এক দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'আলেমগণ ব্যাখ্যা বিবৃতি প্রদান, নিজস্ব লেখা-লেখিতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদানসহ, স্পষ্টতর ভাষায় সতর্ককরণ ও পূর্ণাঙ্গতর বিশ্লেষণ করে প্রতিবাদ করা অত্যন্ত জরুরী যাতে মানুষ এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে। যদি সত্যপথে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকে তবে অবশ্যই তাদেরকে সহযোগিতা করে ফিরিয়ে আনতে হবে । আর যদি সত্যপথে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দলীল খাড়া হয়ে থাকলো। এতে দায়িত্বশীল 'আলেমগণ সুস্পষ্ট ওযরের কারণে আল্লাহর অর্পিত ফারদ (ফরজ) দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি পেয়ে যাবেন।"

আর এই জঘন্য বিদ'য়াঃ ও মহাদুর্যোগ প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যসহ সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে আছে। অনেক সাধারণ মানুষ এই জঘন্য বিদ'য়াতে লিপ্ত অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের প্রতি বিশ্বাস এ বিষয়টি বর্তমানে এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে যার দ্বারা মূল ঈমানও নড়বড় হয়ে পড়েছে; খন্ড-বিখন্ড হয়েছে ইসলামের বাহু। আর এই মহা বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে সমাধি নির্মাণ, সমাধিস্থদের উপর বিশাল বিশাল গম্বুজ নির্মাণে উৎকর্ষ সাধন। কবর যিয়ারতে আগন্তুকদের সম্মুখে বিভিন্ন পন্থায় অতিরঞ্জিত করে কবরের ভীতি ও মহিমা তুলে ধরা। (ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।)

গলৎ 'আকীদাসমূহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি এক বড় ধরনের মাধ্যম যা কোন বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। এটাই মূল তাওহীদ বিরোধী ফিতনার অন্যতম কারণ। এতে যে সন্দেহ পোষণ করবে, যার বিবেক এ বিষয়গুলো মানতে নারাজ তার পক্ষে

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। এই অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজের সহজতর উপায় হচ্ছে:
কিছু 'আম জনতার নিকট এই অর্থের ব্যাখ্যা তলবপূর্বক এ ধরনের 'আকীদার ক্ষেত্রে তার মতামত যাচাই করা। হয়তঃ তাদের প্রত্যেক জনের কাছ থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সব তথ্য যা আমি ইত্যোপূর্বে আলোচনা করেছি।
এ প্রসঙ্গে আল্লামাঃ শাওকানী (রাহ্মাতুল্লাহি 'আলাইহি) জনৈক 'আব্বাসীয় খালীফার ঘটনা ইতিহাস থেকে উদৃত করেছেন। হুবহু তা এখানে তুলে ধরা সমোচীন মনে করছি।
"দূর থেকে আগত জনৈক রাষ্টদূত 'আব্বাসীদের এক খালীফার দরবারে আগমন করল। এ উপলক্ষে খালীফাঃ তাঁর রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এক সমাবেশের আয়োজন করলেন এবং তাদেরকে সেস্থানে রাখলেন যে পথ দিয়ে দূত পরিক্রমা করবে। তারপর বিপুল সংখ্যক বিশেষ বাহিনীকে সুবিশাল হলঘরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। দামী দামী কার্পেট ও মূল্যবান পর্দার কাপড়ে হলঘরটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সুসজ্জিত করলেন। সাজসজ্জার প্রতিটি ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করলেন। আর নিজে উপবেশন করলেন হলরুমের একটি বিশেষ উঁচু স্থানে মর্যাদা ও ভীতির রূপ নিয়ে। দূতের আগমন ঘটল। প্রবেশ করতে থাকলে এক স্থান হতে অন্য স্থান দিয়ে। অতিক্রম করতে থাকল দল হতে দল ঘেঁষে। এক সময় পৌছে গেল হলঘর পর্যন্ত যা অতিক্রমকালে তারও উর্দ্ধের কিছুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ভীতি ও মহিমায় ভরে উঠল তার মন। চতুর্দিকের বিশেষ সাজসজ্জায় সে হতবিহ্বল হতে লাগলো। প্রতিটি প্রবেশ দ্বারের জাঁকঝমক তাকে উদ্বেলিত করতে শুরু করল। খালীফার বিশেষ দু-জন কর্মচারী তাকে বিশেষ স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখল। লোকটির গলা দিয়ে শ্বাস বের হতে পারছিল না, থুতুও গিলতে পারে নি। সেই সাথে খালীফার কারুকার্য খচিত মূল ভবনটি উন্মুক্ত করা হলো। সেখানে সোনা-রূপার চকচকে হাতিয়ারগুলো দাঁড় করানো ছিল। আরো

ছিল জহরতের অমূল্য রত্নরাজি। ঘরটিতে আগর-লোবানের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল রাজকীয় সুগন্ধির সৌরভ। ঠিক এ মুহূর্তে খালীফাঃ আবির্ভূত হলেন দৃষ্টিকাড়া নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমন্ডিত সাজপোষাকে। আর ঐ দূত বেচারার দৃষ্টি যখন এই খালীফার উপর পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠল: কি আশ্চর্য্য! ইনি কি আল্লাহ? সেবাদাস দুজন উত্তর করল, "না! ইনি আল্লাহর খালীফাঃ।"

শাওকানী বলেন: অতিরঞ্জনের প্রভাব দেখুন। জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ আলোকসজ্জা দর্শনে এ বেচারা (দূত)'র কি অবস্থা হয়েছিল? সুতরাং কবর উঁচু করা, পাকা করা ও আলোকসজ্জা করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে শা'রয়ী হুকুমের দূরদর্শিতা ও বাস্তবতা চিন্তা করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের তাওফীক দান করুন। ১

অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করি যে, সত্যবাদী নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কাছ থেকে এ উম্মত কবর বিষয়ে যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা, সতর্কবাণী ও হুমকী জানতে পেরেছে। এর বিপরীতে কী করণীয় এবং বিরোধীতায় কী করা ফারূদ (ফরজ) তাও পূর্ণাঙ্গভাবে তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে তিনি এমনই গুরুত্ব দিয়েছেন যে রোগশয্যায় শায়িত মুমূর্ষ অবস্থায়ও উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ বাণী ছিল:

"আমার কবরকে তোমরা মাসজিদ বা সিজদার স্থানে পরিণত করো না। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ অভিশাপ তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

---

১. নোট: খালীফার বাহ্যিক জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখে রাজদূত এমনই হতভম্ব হয়েছিল যে খালীফাকে আল্লাহ মনে করেছিল। কবরের উপর দামী কাপড় চড়ান এবং সেখানে বাতি জ্বালিয়ে ধূপধুনো ছড়িয়ে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করলে সেখানে যিয়ারতকারী কবরের মধ্যে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে ইলাহী শক্তির অধিকারী মনে করতে পারে। ইসলামে তাই কবরকে অতি সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে রাখারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সম্পাদক)

বুখারী ও মুসলিম শারীফে বর্ণিত আছে। 'আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) আবুল হাইয়াজ আসাদীকে বলেছিলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন সে ধরনের অভিযানে আমি কি তোমাকে প্রেরণ না করে পারি? তিনি বলেছিলেন: কোন উঁচু কবরকে মাটির সমান না করে ফিরে আসবে না এবং কোন ছবি বা মূর্তি নিশ্চিহ্ন না করে ফিরবে না।"

কবরগুলোকে মাটি বরাবর সমতল করার অধ্যায়ে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে যদিও তা কোন বিশিষ্ট মু'মিন বান্দার কবর হোক। আর কাফেরের কবর হলে তো কোন কথাই নাই। মু'মিন, 'আলেম, ওলী, শায়খ ও সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের কবরের ব্যাপারে একই হুকুম। মোট কথা সব কবরই মাটির সমান করে দিতে হবে যা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে কবরের উপরে কিছু লেখা, পাকা করা ও সেখানে বাতি জ্বালানোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বহু হাদীছ বহুসংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত আছে। আল্লামাঃ শাওকানী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিশদভাবে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মোট কথা: সঠিক আকীদার পরিপন্থী পূর্বসূরীদের যে কোন পুস্তক, কাব্যগ্রন্থ, বক্তৃতা ও প্রতিবেদন ও লেখনির মূল উৎপাটন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করা একান্ত জরুরী। এ সব 'আমল এবং কবরবাসীর উপর নির্ভরতার ব্যাপারে মানুষকে সম্ভব্য সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাবধান করতে হবে। শায়খ 'আল্লামাঃ শাওকানী এ ধারণাই দিয়েছেন।

কোন সন্দেহ নেই যে এই কর্মকান্ডগুলো সঠিক তাওহীদ পরিপন্থী ও শিরকে পতিত হওয়ার কারণ। বহু হাদীছে এসব কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কবর অথবা তাঁর কোন উম্মতের কবর (যদিও তিনি 'ইলম ও 'আমলের দিক থেকে অনেক উঁচুদরের ব্যক্তিত্ব) সকলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য।

আমাদের দায়িত্ব তো কেবল দাওয়াত পৌঁছানো। হেদায়েত নসীবওয়ালার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এ বিষয়ে আরও অধিক জ্ঞান অর্জনে ইচ্ছুক হলে 'আল্লামা ইমাম শাওকানী (রাহমাতুল্লাহি) রচিত গ্রন্থাবলী পড়ুন এবং সেসবের মধ্যে পাবেন অনেক সন্তোষজনক প্রতিবেদন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর ।

পরিশিষ্ট–১

আল্লাহর কাছে দু'য়া করা 'ইবাদত, আর অন্যের নিকট দু'য়া কর শিরক কেন?

'ইবাদতের হাকীকত হচ্ছে: আল্লাহর কাছে বিনয় ও নতীস্বীকার এবং গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন। মুখে উচ্চারণ ও অন্তরে আকুতি হচ্ছে এ হাকীকতের প্রকৃত অবস্থা। তাইতো কোন মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট দু'য়া করে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চায় তখন সব ব্যাপারে তাঁরই মুখাপেক্ষী প্রমাণ হয়। দু'য়া করার সময় প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার কথা শুনছেন, অন্য দু'য়াকারীকেও দেখছেন ও শুনছেন। তাঁর কাছে এক শ্রবণ অন্য শ্রবণের প্রতিবন্ধক হয় না, ভাষাও এলোমেলো হয় না। এক আওয়াজ অন্য আওয়াজের সাথে সংমিশ্রণ হয় না। তিনি মুখের কথা শুনতে পান, অন্তরের বাস্তব অবস্থা জানেন। বান্দা যখন তার প্রতিপালককে ডাকে তখন সে উত্তর পাওয়ার আশা রাখে কারণ সে দৃঢ় বিশ্বাসী যে আল্লাহ তার ডাকের উত্তর দানে পূর্ণ সক্ষম। একই সময়ে যদি সকল লোক তাঁকে ডাকে তবুও তিনি প্রত্যেকের ডাকে সাড়া দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। দু'য়ার স্থান যেখানেই হোক আর বান্দার চাওয়া ও পাওয়া যতই বিচিত্র হোক - রাব্বুল 'আলামীন তা প্রদানে সক্ষম। দু'য়ার মাধ্যমে বান্দা তার রাবের সাথে গভীর সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাই তো হাদীছ শারীফে দু'য়াকে বলা হয়েছে 'ইবাদত। কখনো বলা হয়েছে ইবাদতের সারাংশ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবে দু'য়ার নাম দিয়েছেন 'ইবাদাত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾
(غافر- ٦٠)

আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: আমার নিকট দু'য়া কর: আমি তোমাদের দু'য়া কবুল করব। যারা অহংকারবশতঃ আমার কাছে দু'য়া করা থেকে বিমুখ থাকে তারা অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরাঃ গাফের, ৬০)

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (العنكبوت - ٦٥)

যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। আর যখন আল্লাহ তাদেরকে তীরে পৌছে দিয়ে মুক্তি দেন তখনই তারা শিরক করে। (সূরাঃ আনকাবূত, ৬৫)

অর্থাৎ তারা অন্যকেও আল্লাহর সাথে ডাকে।

অন্যান্য 'ইবাদতের মতো বান্দাদেরকে দু'য়া করা জন্য নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ... ﴾ (الأعراف - ٥٥)

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে বিনীত হৃদয়ে সংগোপনে ডাক।

(সূরাঃ আন-আ'রাফ, ৫৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

(البقرة - ١٨٦)

আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে প্রশ্ন করে তো বেলো যে) আমি কাছেই রয়েছি। কোন দু'য়াকারী দু'য়া করলে দু'য়া আমি কবূল করি। সুতরাং আমার আদেশ মান্য করো এবং আমার প্রতি পূর্ণ ঈমান আন যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।

(সূরাঃ বাকারাঃ - ১৮৬)

দু'য়াকারী আল্লাহর গুণাবলী ও প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী স্মরণ করেই দু'য়া করে থাকে। এজন্যই এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'য়া করা শিরক।

পৌত্তলিকরা জ্বিন, ফেরেস্তা অথবা উর্দ্ধোলোকের গ্রহ-নক্ষত্রের নিকট দু'য়া করে। খ্রিস্টানরা মরিয়ম ('আলাইহিস সালাম) অথবা পবিত্র আত্মার (মরিয়ম ও ঈসা) নিকট দু'য়া করে। যখন নির্বোধ মুসলমানরা অনুপস্থিত কোন পুণ্যবান ব্যক্তি অথবা কবরস্থিত মৃতের নিকট দু'য়া করে তো এদের সাথে ওদের তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। এ তিন শ্রেণীর লোকেরা (পৌত্তলিক, খ্রিস্টান ও নির্বোধ মুসলিম) যার নিকট দু'য়া করে তার প্রতি এদের প্রয়োজন পূরণ, মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরতা পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে যার কাছে তারা দু'য়া করছে তারা এদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করছে এবং এদের দু'য়া শুনছে। কোন শ্রবণ ও দর্শন এদের শ্রবণ ও দর্শনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের ভাষারও গোলমাল হয় না এবং কণ্ঠাবলীর সংমিশ্রণও হয় না। তাদের মুখের কথা তারা (কবরস্থিত ব্যক্তিরা) শুনতে পায়, তাদের অবস্থা সম্পর্কে এরা সম্যক অবগত। তারা যখন এদের নিকট দু'য়া করে তখন পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, তারা (কবরস্থিত ব্যক্তিরা) তার দু'য়া এবং অন্যদের দু'য়া একই সংগে কবুল করতে সক্ষম; যতই কালের ভিন্নতা এবং স্থানের ভিন্নতা হোক এতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। এ অবস্থায় দায়ী (দু'য়াকারী) যার কাছে দু'য়া করে তার মহিমা মর্যাদা, তার প্রতি বিনয় ও আন্তরিকভাবে গভীর সম্পর্কে গড়ে তোলে এবং রুহানী ফয়েজ ও বরকতের আশা করে।

পাঠক! যখন বুঝতে পেরেছেন যে উপরোল্লেখিত বিষয়বস্তু দু'য়ার মূল বৈশিষ্ট; তাহলে গভীরভাবে লক্ষ্য করুন এ সবগুলো গুণাবলীর একমাত্র হকদার মহান আল্লাহ তা'য়ালা। এ সমস্ত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে সমকক্ষ মনে করে দু'য়া করলে সে অবশ্যই শিরকের মত জঘন্য পাপে লিপ্ত হবে অর্থাৎ তার ধ্যান ধারণায় আল্লাহ ও কবরস্থিত ব্যক্তির মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না

যেমন বলেছিল মাক্কার মুশরীকরা যে: এই মূর্তিগুলো আমাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে আমাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে। তাহলে কবরপূজারী ও মাক্কার মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য কি রইল? আল্লাহ তা'য়ালা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (يونس- ١٨)

আল্লাহকে ছেড়ে তারা যার ইবাদত করে তা তাদের কোন উপকারও করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না; তারা বলে- এগুলো (প্রতিমা) আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারীশকারী। (সূরাঃ ইয়ুনুস, ১৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ... ﴾ (الزمر- ٣)

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে (তারা বলে) আমরা এদের ইবাদত শুধু এ জন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। (সূরাঃ যুমার, ৩)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দলীল প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

﴿ قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ﴾ (الإسراء: ٥٦-٥٧)

বল, তোমরা (আল্লাহ ব্যতীত) যাদেরকে ইলাহ মনে কর (তাদেরকে) আহবান কর, (করলে দেখতে পাবে) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার

অথবা পরিবর্তন করার কোন শক্তি তাদের নেই। ওরা যাদেরকে আহবান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে। তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। (সূরাঃ ইসরা, ৫৬-৫৭)

আল্লাহ তা'য়ালা জানান যে যাদের কাছে মুশরিকরা দু'য়া বা প্রার্থনা করে তারা তো সৎ বান্দা ছিলেন। ফেরেশতা হোক অথবা আল্লাহর ওলী হোক প্রত্যেকেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাঁর নিকট উচ্চ মর্যাদা কামনা করত। সকলেই তাদের সৎকর্মের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করত। আল্লাহর রহমতের আকাঙ্খা করত এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করত।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বারবার জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর সঙ্গে অন্যকে যুক্ত করে দু'য়া করা শিরক।

আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ ﴾ (الجن)

এবং মাসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য সুতরাং আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না। আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা (জীন) দলে দলে তার নিকট ভীড় জমাল। বলো, আমি আমার প্রতিপালককেই শুধু ডাকি, তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করি না। বলো, আমি তোমাদের অনিষ্ট সাধন বা সুপথ প্রদর্শনের অধিকার রাখি না। (সূরাঃ জিন, ১৮-২১)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴾ (يونس)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না যা তোমাদের উপকার করে না অপকারও করে না। আর তা করলে তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভক্ত হবে। আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দিলে তিনি ব্যতীত আর কেউ এর মোচনকারী নেই আর তিনি মঙ্গল করলে তা রদ করার কেউই নেই। বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি মঙ্গল দান করেন; তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরাঃ য়ূনুস, ১০৬-১০৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿...قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر- ٣٨)

বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি! আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর বদলে যাদেরকে ডাক তারা কি অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ

বোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্টঃ নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক। (সূরা যুমার, ৩৮)

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে ব্যাপারটি এত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মুসলিমের নিকট তা অজ্ঞাত। জ্ঞানবিজ্ঞানের দাবীদার ব্যক্তিরাও তা জানেন না। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে এ স্পষ্ট বিষয়টি নিয়ে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী হিসাবে খ্যাত 'আলেমগণও উদাসীন।

একবার জনৈক সমস্যা-জর্জরিত ও বিষন্ন ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে এক কবরবাসীকে সম্বোধন করে বলছেঃ ওহে! আমাকে কার কাছে ছেড়ে গেলে?

উপরন্তু তাওহীদের পীঠস্থান কাবাঃ ঘরের তাওয়াফ কালে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 'ইবাদতের পরিবর্তে কিছু তাওয়াফকারী আল্লাহকে ছেড়ে অন্য পুণ্যবান ব্যক্তির নিকট দু'য়া ও সাহায্য প্রার্থনা করে।

এই নির্বোধ মুসলিমদেরকেই যখন আল্লাহর নিকট অজ্ঞতার কৈফিয়ত দিতে হবে তাহলে 'আলেম হিসেবে খ্যাতদের কি দশা হতে পারে?

আল্লাহ তা'য়ালা তো সত্যই বলেছেন:

﴿...وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا﴾ (الكهف - ٥٤)

অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বিতর্ক করে থাকে। (সূরা আল-কাহাফ - ৫৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র বাণী:

"আরব উপদ্বীপে (আরব রাষ্ট্রসমূহ) গাইরুল্লাহর 'ইবাদত হবে না। তাই শয়তান নিরাশ হয়েছে।"

এ হাদীছের অপব্যাখ্যায় তারা অযৌক্তিক যুক্তি খাড়া করে দাবী করে যে, গাইরুল্লাহর নিকট দু'য়া করা শিরক নয়। অথচ 'আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিরক ও বিদ'য়াতের ব্যাপক বিস্তার ও প্রয়োগ দেদারছে চলছে। বিতর্কে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে 'আলেম নামে খ্যাত বিতর্কীদের বিতর্কের চেয়ে স্পষ্টতর অন্যায় বিতর্ক আর কি হতে পারে? গোঁড়া যুক্তিবাদীদের দাবী অনুসারে হাদীছের অর্থ

দাড়াচ্ছে 'আরব উপদ্বীপে ভবিষ্যতে কখনো শিরকের অস্তিত্ব মিলবে না।

ঐসব তথাকথিত 'আলেমের মতে কি গাইরুল্লাহর নিকট দু'য়া করা তাহলে শিরক বিবেচিত হয় না? অথচ 'আরব দেশসমূহে অহরহ চলছে মৃত ব্যক্তিদের নিকট দু'য়া করা ও কিছু চাওয়া পাওয়ার বাস্তব চিত্র। গাইরুল্লাহর নিকট দু'য়া করা যদি শিরক না হয় তা শিরক আর কাকে বলা যাবে?

'আরব উপদ্বীপে আবার প্রতিমার পূজা হবে - এ সম্বন্ধে সাহীহ হাদীছসমূহের কী অজুহাত তারা দেখাবে? লিপিবদ্ধ ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র ইন্তেকালের পর 'আরব ভূখন্ডে কিছু 'আরব মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। তাদের সম্পদকে পরিণত করেছিলেন গণীমতে; তাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে এসেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের সাথে কৃত আচরণের অনুরূপ আচরণ করেছেন তাদের সাথে। এই অজ্ঞ, ঝগড়াটে, বিবাদী 'আলেমের স্বেচ্ছাচারিতার ন্যায় নবুওয়াতী মর্যদার শানে আর কি অজ্ঞতা ও বেয়াদবী থাকতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র হাসীছসমূহের অপব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক দৃষ্টান্ত পেশ করে এক হাদীছের সাথে অন্য হাদীছের গোঁজামিল দিয়ে তারা বাজীমাত করতে চায়। পরিশেষে এসব তথাকথিত 'আলেমরাই বাস্তববিরোধী ও পরস্পর বিরোধিতার দাবী তুলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যারোপ করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।

হে আমাতের প্রতিপালক! আমাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে (আপনার দীন থেকে) ঘুরিয়ে দিবেন না। আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বদাতা, সর্বজ্ঞানী।

পরিশিষ্ট - ২

কাফের ঘোষণার মাসয়ালা

আহলুল 'ইলমদের আলোচনায় এমন কিছু কথা স্থান পায় যার ভাবার্থ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন অনুপস্থিত অথবা মৃত ব্যক্তিবর্গের নিকট দু'য়া করে সে মুশরিক (শিরককারী) হয়ে যায় অর্থাৎ সে যেন মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে গেছে; সুতরাং মুশরিকদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়ে থাকে সেও অনুরূপ আচরণের হকদার। বাস্তবে কিন্তু এটা উদ্দেশ্য নয়; কেননা 'আলেমগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) শরী'য়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে সামান্য অজুহাতে কোন ব্যক্তিকে কাফের বলে ফেলবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়; বরং তাঁরা এ বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে (মন্দ) কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু (কর্মের) কর্তাকে কাফের হিসাবে বিবেচনা করেন নি যা তাদের আচার ব্যবহারের মাধ্যমে বুঝা যায়।

বাস্তবে যেসব সাধারণ মুসলিম এ ধরনের ভয়াবহ অবস্থানে নিপতিত তাদের জন্য এ কথা বলা জরুরী নয় যে ব্যক্তি অমুক কাজ করে সে আহলুন কেবলা বা মুসলিমীনদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে গেছে। এমনি ভাবে সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত বলে তার বিরুদ্ধে হুকুম লাগানো এবং তার সাথে মুশরিকদের অনুরূপ আচরণ করা কোনটাই ঠিক হবে না কেননা মাযহাবের আনুসাঙ্গিকতা মাযহাব বলে বিবেচিত হয় না।

শিরক বা কুফরের পর্যায়ে এমন কর্মকান্ডে সমাজের কিছু নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত শ্রেণীর লোক জড়িয়ে আছে তাদেরকেও কাফের বলা যাবে না কারণ হয়ত তাদের বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ দলীল নেই। অথবা প্রামাণ্য বস্তু তাদের নিকট সঠিক ভাবে পৌঁছে নি। অথবা তাদের নিকট কোন সংশয় উপস্থাপন করা হয়েছে

যেমনটি ঘটেছিল হাওয়ারীয়ূনদের একজনের জীবনে: যে বলেছিল: "তোমার প্রতিপালক কী তা করতে পারবে? "১

বণী ইসরা'য়ীলের এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে পুত্রকে বলেছিল, "আমার মৃত্যু হলে আমাকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবে তাহলে আল্লাহ্‌ আমাকে আর ধরতে পারবেন না। আল্লাহর শপথ! যদি তিনি আমাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন কঠিন শাস্তি দেবেন যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেন নি।" তার মৃত্যু হলে তাকে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছিল। আল্লাহ তাকে পুনরুত্থান করে জিজ্ঞেস করলেন: কিসে তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল? লোকটি উত্তরে বলল: "তোমারই ভয়ে, হে প্রতিপালক! তাই আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

(আল্লাহকে ভয় করাও এক ধরনের 'ইবাদত; তাই সে আল্লাহ্‌র রহমতের হকদার হয়েছিল)

কোন কোন সাহাবী, তাবে'য়ী এবং ইমামের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং কোন কাজ কুফর বিবেচিত হলেও সে কাজের কর্তাকে কাফের ঘোষণা করা যায় না। অথবা কাজটি ফিস্‌ক হলেই কর্তাকে ফাসেক বলা যাবে না। ব্যাপারটি বিদ'য়াত হলে এর কর্তাকে বিদ'য়াতী বলে যাবে না। এটা এমনই এক অধ্যায় যা থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত কারণ কাফের বিবেচিত হওয়ার উপযোগী নয় এমন কাউকে কাফের বলার ব্যাপরে কঠোরভাবে হুমকি এসেছে।

যে সব নির্বোধ মুসলমান এ ধরনের শিরকে লিপ্ত তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ক্ষমারযোগ্য কারণ এটা নিশ্চিত যে তারা যদি এটাকে শিরক বলে জানত বা এটা ইসলামবিরোধী মনে করত তাহলে তা করতো না। যদি তাদের কেউকে ইসলাম ছেড়ে কুফর গ্রহণ করার জন্য তরবারীর সম্মুখে উপস্থিত করা হত তাহলে ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার ভয়ে হত্যাকেই তারা গ্রহণ করে নিত।

----

১. প্রকাশ্য অর্থে এ কথাটি তো কুফরী কথা কিন্তু এ কথার বক্তার আন্তরিক উদ্দেশ্য তা ছিল না বরং সে তো আল্লাহর মোজেজাঃ দেখার নিয়তে বিস্ময়ের সূত্রেই তা বলেছিল। তাই তার কথাকে কুফরী ধরা হয় নি।

(অর্থাৎ তাদের অন্তরে আছে ইসলামপ্রীতি কিন্তু তারা অজ্ঞ) বিপদটা ভয়ানক তো 'আলেম সমাজের জন্যই যারা 'ইবাদতের হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞাত এবং শিরক ও তাওহীদের মধ্যকার পার্থক্যে তারা অবহিত। এ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াতগুলোও তাঁরা জানেন। তারপরও তাঁরা সাধারণ মানুষের পথ অনুসরণ করে এ বিপদজনক ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। আরও ভয়াবহ বিপদ যে তারা এসব নিয়ে তর্ক করে। শিরকের কার্যকলাপকে সাজ-শোভায় উপস্থাপন করে সর্বসাধারণকে ধুম্রজালে ফেলে দেয়, অন্যায় কল্পনা ও ভ্রান্ত সংশয় দ্বারা তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিমুখ রাখে। একটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে কর্ম ও কর্তার বিচার-বিবেচনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং নিছক কর্মের দ্বারা কেউকে কাফের বিবেচনা করা যায় না বা কর্তাকে কাফের বলা আবশ্যক হয় না।

জনৈক 'আলেম তাঁর প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে কাফের বলতে পারি না কিন্তু তোমার মতো আমি যদি অনুরূপ উক্তি করি তো আমি কিন্তু কাফের হয়ে যাব অর্থাৎ আমি জানি যে, এ উক্তিটিও কুফরী। তাই আমি বললে কাফের হয়ে যাব তার তুমি বললে তা হবে না কেননা তুমি ওটাকে কুফর বলে ধারণা কর না হয়ত বা সেটা তোমার অজ্ঞনতাবশতঃ বা কোন অপব্যাখ্যার কারণে - ফলতঃ আমি তোমাকে কাফের বলতে পারি না।"

শাওকানী (রহ) সাইলুল জাররার (চতুর্থ খন্ড ৫৭৮ পৃষ্ঠা) কিতাবে বলেন: প্রত্যেক মুসলিমের জেনে রাখা দরকার যে: কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ ও শামীল করার হুকুম জারি করার ব্যাপারে দিনের সূর্যের মত স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ ছাড়া তা করা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মুসলিমের জন্য উচিত নয় কেননা এ বিষয়ে স্পষ্ট সনদে সহীহ হাদীছসমূহ বর্ণিত এবং সাহাবীদের জামা'য়াত থেকে বর্ণিত যে: "কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে যদি বলে: হে কাফের ! তাহলে অবশ্যই তাদের কোন একজনের উপর এ বিষয়টি প্রত্যাবর্তন করবে।" এরূপ হাদীছ বুখারীতে

এককভাবে এবং কিছু শব্দের কমবেশিতে বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে : যদি কেউ কোন মুসলিমকে কাফের বলে সম্বোধন করে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে এরূপ নয় তাহলে তার কথা তারই দিকে ফিরে আসবে। বুখারীতে অন্য শব্দে বলা হয়েছে যে: তাদের কোন একজন অবশ্যই কাফের হবে। এ সব হাদীছ থেকে বর্ণিত যে চটজলদী কাউকে কাফের ঘোষণা করার ব্যাপারে খুবই সীমাবদ্ধতা ও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তবে কাফের বলা যায় এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

আর যাদের অন্তর কুফরীর জন্য উন্মুক্ত রয়েছে...

(সূরাঃ আন-নাহল আয়াঃ ১০৬)

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কাফের বলতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ঐ ব্যক্তির অন্তর কুফরের জন্য উন্মুক্ত; এ ব্যাপারে তার হৃদয়ে তুষ্টি এবং অন্তরে খুশিভাব থাকতে হবে।

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে মন্দ কাজে লিপ্ত দেখলেই কাফের বলা যাবে না। বিশেষভাবে যে যখন অজ্ঞতাবশতঃ ইসলামী তরীকাঃ পরিপন্থী কাজ করে। এমনিভাবে কুফরী কাজের কর্তাকে একথাও বলা যাবে না যে: 'সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের মিল্লাতে শামীল হয়ে গেছে'। যে এমন শব্দ উচ্চারণ করল যা কুফরী অর্থে ব্যবহৃত অথচ সে এর অর্থ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয় তাহলে তাকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না।

যদি তুমি বলো যে সুন্নাত বা হাদীছ থেকে পাওয়া যায়: *যে ব্যক্তি ইসলামী মিল্লাতের বিপরীতে হলফ করে সে কাফের।* অন্য হাদীছ শারীফে বর্ণিত: যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফের বলবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। হাদীছ শারীফে দৃঢ়ভাবে বর্ণিত আছে: শরী'য়ত পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত ব্যক্তির উপর কুফরীর হুকুম দেয়া যাবে। আরও একটি হাদীছে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: *আমার পরে তোমরা কুফরীতে ফিরে যেয়ো না, কেননা*

তোমাদের কিছু লোক তোমাদেরই গর্দান উড়িয়ে দিবে। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীছ আছে। উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয়ই তো কাফের সাব্যস্ত করে যদিও এ উক্তিগুলির উচ্চারণকারী ও সম্পাদনকারী ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী ধর্ম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য না হয়!

যদি বলো - যাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে যারা অক্ষম এবং এ ধরনের হাদীছের মর্ম অনুধাবন যাদের পক্ষে কঠিন তাদের জন্য উচিৎ বর্ণিত হাদীছসমূহ বারবার পড়া এবং হাদীছের মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদেরকে কাফের এবং যে কাজকে কুফরী বলে গেছেন সেগুলো সেভাবেই থাকবে এর কোন পরিবর্তন হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্যের জন্য কোন মুসলিমকে কাফের বলা বৈধ হবে না কেননা তিনি আল্লাহর নাবী; তাঁর কাছে ওহি আসতো আর আমাদের কাছে ওহি আসে না, আসবেও না। তবে যে ব্যক্তি কুফরী গ্রহণ করার জন্য অন্তর উন্মুক্ত করে রেখেছে তার কথা ভিন্ন অর্থাৎ যে নিজেকে প্রকাশ্য কাফের ঘোষণা দেবে শুধু তাকেই কাফের বলা যাবে। এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই ভয়াবহ বিপদ ও মসীবত থেকে নিরাপদ থাকা যাবে কেননা দীনের প্রতি যার আগ্রহ আছে সে কখনো এ বিপদজনক বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারে না এবং অকল্যাণকর কাজে অন্যকেও অনুমতি দিতে পারে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদেরকে কাফের এবং যে কাজকে কুফরী বলে গেছেন এ ব্যাপারে গবেষণা করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে গবেষক কিভাবে অন্যকে কাফের বলার ব্যাপারে ভীত থাকবেন। উপরে আমি যা আলোচনা করছি এর প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা যেন এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাঃ ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। তবেই তো মূল বিষয়টা জানা যাবে।

অতএব কাউকে কাফের বলে সম্বোধন না করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য্য তবে যারা কুফরী করার জন্য অন্তর উন্মুক্ত করে

রেখেছে তাদের ব্যাপার ভিন্ন। কাউকে কাফের বলার ব্যাপারে এখানে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং সত্য বিষয়ই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কবির ভাষায়: সত্য ও সঠিক পন্থা আমাকে আহবান করে বলো:

হে প্রিয় বৎস! সত্য-ন্যায়ের পথ তো তোমার জন্য উন্মুক্ত;
তবে কেন প্রবৃত্তির অনুসরণ?

'আল-লাইলুল জারার' নামক অন্য গ্রন্থে শায়খ বলেন: অনেক লোক একদিকে ইসলাম এবং মুসলিমীনদের জন্য কেঁদে বুক ভাসায় অন্যদিকে চরম পক্ষ্যপাতিত্ব অবলম্বনে অধিকাংশ মুসলিমীনের উপর কুফরীর ফাতাওয়া দেয়। তাদের এ ফাতাওয়া কুরআন, সুন্নাঃ, ইসলামের বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য নয় বরং যখনই দীনের মধ্যে কোন প্রভাবশালী মহল প্রভাব বিস্তার করার জন্য। এ অবস্থায় অভিশপ্ত শয়তান এমন কু-মন্ত্রণা দেয় যাতে মুসলিমীনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এবং একে অপরের প্রতি অপবাদ ও কুৎসা রটানোর সব পদ্ধতী সকৌশলে তাদের শিখিয়ে দেয়। দৃশ্যত এদের অবস্থান বাতাসে উড়ন্ত মৃত্তিকার ধুলি-কণা ও বন্য প্রাণীর আড্ডাখানার মতো।

হায় আল্লাহ! আপসোস মুসলিমীনদের এ চরম দূর্যোগের জন্য! যা দীন ইসলামের ও ইসলাম প্রিয়দের জন্য মহাবিপদ। এটা এক বড় ধরণের প্রতিবন্ধক যা মু'মিনীনদের ঈমানের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে আছে।

যাদের মধ্যে ইসলামী আত্মসম্মানবোধ ও সামান্যতম জ্ঞানের আভা পরিস্ফুট এবং যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে তাদের নিকট এ বিষয়গুলো পরিষ্কার। আর যাদের নিকট দীনি 'ইলম রয়েছে তাদের তো এটা জানা কথা যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন :

ইসলাম হচ্ছে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' র সাক্ষ্য দেয়া, যথাযথভাবে সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হাজ্জ করা, রমাদান মাসে রোজা রাখা। এ হাদীছটি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক যামানায় প্রায়

সকল মুহাদ্দিসগণই রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং যে এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে সে মুসলিম। অনিচ্ছা সত্ত্বে সে যদি কোন বিষয়ে বিরোধপূর্ণ 'আমল করে তাতে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এমন কথা বলা যাবে না। আর যে ব্যক্তি মূর্খতাবশতঃ অসঙ্গত উক্তির মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করলে তার এ উক্তিগুলো তারই মুখে ছুঁড়ে মারো অর্থাৎ তাকে ধমক দিয়ে বলো: তোমার এ বিষয়গুলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র হাদীছের মাধ্যমে যাঁচাই কর। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

তোমরা সকল উক্তিকে মুহাম্মাদের উক্তি (হাদীছ) দিয়ে পরিমাপ কর; নচেৎ তার দীনের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে নিরাপত্তা খুঁজে পাবে না।

আর যে ব্যক্তি ইসলামের উক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় যথাযতভাবে পালন করবে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র আদেশ তো উপরের হাদীছে উলেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি আরও দিগনির্দেশ দিয়েছেন তা কোন ব্যক্তি যদি ঈমান আনে: আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাইকাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ও ভাল-মন্দের তাকদীরের প্রতি - তাহলে সে মু'মিন হলো অর্থাৎ যে এ বিষয়ে বিশ্বাস করবে সে সত্যিকারের মু'মিন। এ হাদীছটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে অর্থাৎ প্রত্যেক যামানায় প্রায় সকল মুহাদ্দিসগণই এ হাদীছটি রেওয়ায়েত করেছেন।

এখন আমি কুরআন ও হাদীছ থেকে এমন সব দলীল পেশ করব যাতে কোন মুসলিমকে কাফের বলার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা দেয়া হয়েছে এবং মুসলিমীনদের ইজ্জতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সব ধরণের নিন্দা, দুর্নাম, অপবাদ, ছিদ্রান্বেষণ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া করা হয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়: স্পষ্ট দলীল থাকা সত্ত্বেও সামান্য অজুহাতে কোন মুসলিমকে কুফরীর অপবাদ দিয়ে বলা যাবে না : সে ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলামী শরী'য়ত তাদের এ অপরাধকে কুফরীর মত কঠিন অপরাধ হিসাবে গণ্য করে না এবং এ ধরনের শাস্তির যোগ্য বলেও বিবেচিত করে না।

অতএব কোথায় সে সব লোক যারা আপন মুসলিম ভাইকে কুফরীর অপবাদে জর্জরিত করে। তারা কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র হাদীছগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে না! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: *শপথ: ঐ জাতের যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের মধ্যে কেউই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষন সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে।*

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র অন্য কাওল সাহীহ হাদীছে বর্ণিত :

মুসলিমগণ পরস্পরে ভাই ভাই, তার উপর যুলম করা যাবে না এবং (শয়তান বা শত্রুর) কাছে সঁপে দেয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

মুসলিমদেরকে গালি দেয়া ফিসক এবং হত্যা করা কুফর।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

নিশ্চয়ই মুসলিমীনদের রক্তপাত এবং তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করা অন্য মুসলিমের জন্য হারাম।

এ রকম আর কত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করতে হবে? মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালার হাতে আমাদের সকলের হেদায়েত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হেদায়েত করতে পার না কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন।

(সূরাঃ আল কাসাস, আয়াঃ ৫৬)

গোমরাহীতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যারা এই পুস্তিকা এবং এ ধরণের তাওহীদ ও শিরক বিষয়ের সুস্পষ্ট লিখিত রেসালা/পুস্তিকাগুলি পাঠ করবে এ সতর্কতা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করাবে। যখন পাঠক

তাড়াহুড়ো করে সতর্কসম্বলীত 'ইবারাতগুলির (আয়াত বা হাদীসগুলির) প্রকৃত অর্থ অনুধাবন না করে পাঠ করে তখন তারা স্বল্প জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাবে বিভ্রান্ত হয়। সাধারণ মুসলিমীনদের যারা বর্ণীত শিরকী কাজে লিপ্ত ইসলামের চরম দুরাবস্থা, দূরদর্শি 'উলামার স্বল্পতা, শক্তির প্রভাব, শয়তানের ধোঁকা, অবাধ্য জ্বিন ও মানুষের সহযোগীতার কারণে তাদেরকে কাফের বলতে থাকে।

অতএব, দ্বীনের শিক্ষিত লোকদের জন্য জরুরী হলো তারা সাধারণ মানুষদেরকে এ ব্যাপারে নসীহত করবে এবং সত্য বিষকে স্পষ্টভাবে তাদের সামনে তুলে ধরবে। প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে সর্বসাধারন মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহবান করবে এবং তাদের সাথে উত্তমরূপে মতবিনিময় করবে। আর তাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথে পরিচালিত করুণ এ আগ্রহে এবং তাদের দুঃখে দুঃখি হয়ে ও তাদের প্রতি দয়া পরশ হয়ে পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচণা করে উপরোল্লিখত বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করবে যাতে তাদের সৃতিপটে ও চিন্তা-চেতনায় এ শিরকী বিষয়গুলির প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয়।

আর আল্লাহ তা'য়ালা রহমত বর্ষণ করুন ঐ ব্যক্তির (নাবীর) উপর যার প্রতিপালক তাঁর গুণাগুণ নিজের ভাষায় বয়ান করে বলেছেন:

(عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)

(سورة التوبة -١٢٨)

যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামনাকারী, মু'মিনদের প্রতি দয়াপরশ ও পরম দয়ালু।

(সূরাঃ তাওবা: আয়াঃ ১২৮)

পরিশিষ্ট- ৩

সদুপদেশ ও সৎপথ প্রদর্শন ব্যাপারে প্রশ্ন ও জবাব

প্রশ্ন: আমরা যে গ্রামে বাস করি সেখানে একটা কবর আছে। গ্রামবাসীদের ধারণা যে সেটি সাইয়্যেদ হুনাইশ নামে এক ওলীর কবর। যুগ যুগ ধরে এ নিয়ে গ্রামবাসীরা বিশৃংখলা করে আসছে। ইমাম সান'য়ানী রচিত:(تطهير) গ্রন্থে বিবৃত সব কর্মকান্ডই তারা করে আসছে ঐ কবরকে কেন্দ্র করে। ফরিয়াদ, মানত ও যবাই সবই চলছে কবরকে কেন্দ্র করে। আমরা একদল যুবক কবরটা ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়েছিলাম কিন্তু গ্রামবাসীরা তা চায় নি বরং আমাদের যুবকদলের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে রুখে দাড়িয়েছে। সরকারের নিকট তা ভেঙ্গে দেয়ার আবেদন করে ছিলাম কিন্তু কর্ণপাত করে নি।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র বাণী:

((لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته))

"একটি উঁচু কবরও মাটি সমান না করে রেখে এসো না।"

অপর বাণী:

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي ...))

"তোমাদের কেউ অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে সে যেন হাত দ্বারা তার পরিবর্তন করে।......"

এই হাদীছ দুটোর অবলম্বনে আমাদের যুবকদের কেউ কেউ গ্রামবাসীদের ঘুমন্তাবস্থায় কবরটি ভেঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। আপনাদের মতামত কি? উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: জিহাদ এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, মানবজাতির হেদায়েতের কয়েকটি মাধ্যম এবং আল্লাহর কালিমাকে সর্বদা সমুন্নত রাখার প্রয়াস সাধ্যমত অব্যাহত রাখতে হবে তবে; তা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এ কাজে আগ্রহী ব্যক্তি যদি মনে

করে যে এ ধরনের কাজের বাস্তবায়নে বড় ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হবে তা হলে তা থেকে বিরত থাকাই উত্তম নইলে এর দ্বারা বড় ধরনের অশান্তি ঘটতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ﴾ (الأنعام- ١٠٨)

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না তাহলে তারাও ধৃষ্টতাপূর্বক অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দিবে।
(সূরাঃ আন'য়াম, ১০৮)

মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে ও সাহাবাগণকে মুশরিক ও তাদের প্রতিমাদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন। তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে তাদের প্রতিমাকে গালি দিলে তারাও আল্লাহর প্রতি মন্দ কথা বলত।

এ অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবর ভাঙ্গায় গোলযোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে অথচ তোমাদের লক্ষ্যমাত্রা আদৌ অর্জিত হবে না বরং গ্রামবাসীরা অথবা সরকার কবরটির পুনর্নির্মাণ করবে। এতে গ্রামবাসীদের মাঝে কবরমুখীতা ও কবরপ্রীতি প্রকটভাবে বৃদ্ধি পাবে। এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকাই সাধারণ রীতি।

আমাদের মতামত হচ্ছে তোমরা সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার সাথে সদুপোদেশদানে মানুষের মাঝে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে দাওয়াতের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর এবং তার কাছে দু'য়া করতে থাক। যখন তোমাদের কাজে ও কর্মের একনিষ্ঠতা ও সততা প্রমাণিত হবে তখন আল্লাহ তোমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করবেন। নবাগত প্রজন্মরা তোমাদের দাওয়াতী কাজে অতি শীঘ্রই তুষ্ট হবে। আর তখনই গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় কবর ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হবে এবং নিজদেরকে শিরক মুক্ত করে নিবে এবং একত্ববাদের প্রতি আহবানকারীদেরকে স্বাগত জানাবে।

মনে রেখো! তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিমান্বিত নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তেরটি বৎসর নিজ গোত্রের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। মহান ঘরের তাওয়াফ করতেন, সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন অথচ সে ঘরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা ছিল; তবুও তিনি চুপ ছিলেন। যখন মাক্কাঃ বিজয় করে আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছিলেন তখন বিজয়ী সম্রাটের বেশে তিনি মাক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং আল্লাহর ঘরকে প্রতিমামুক্ত করে মহান ঘরের পবিত্রতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। (সব কাজের উপযুক্ত সময় আছে)

সব সময়ই আমরা আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করি।

* * * * *